পলিটিক্স বনাম পলিট্রিক্স

হাসান ফকরী

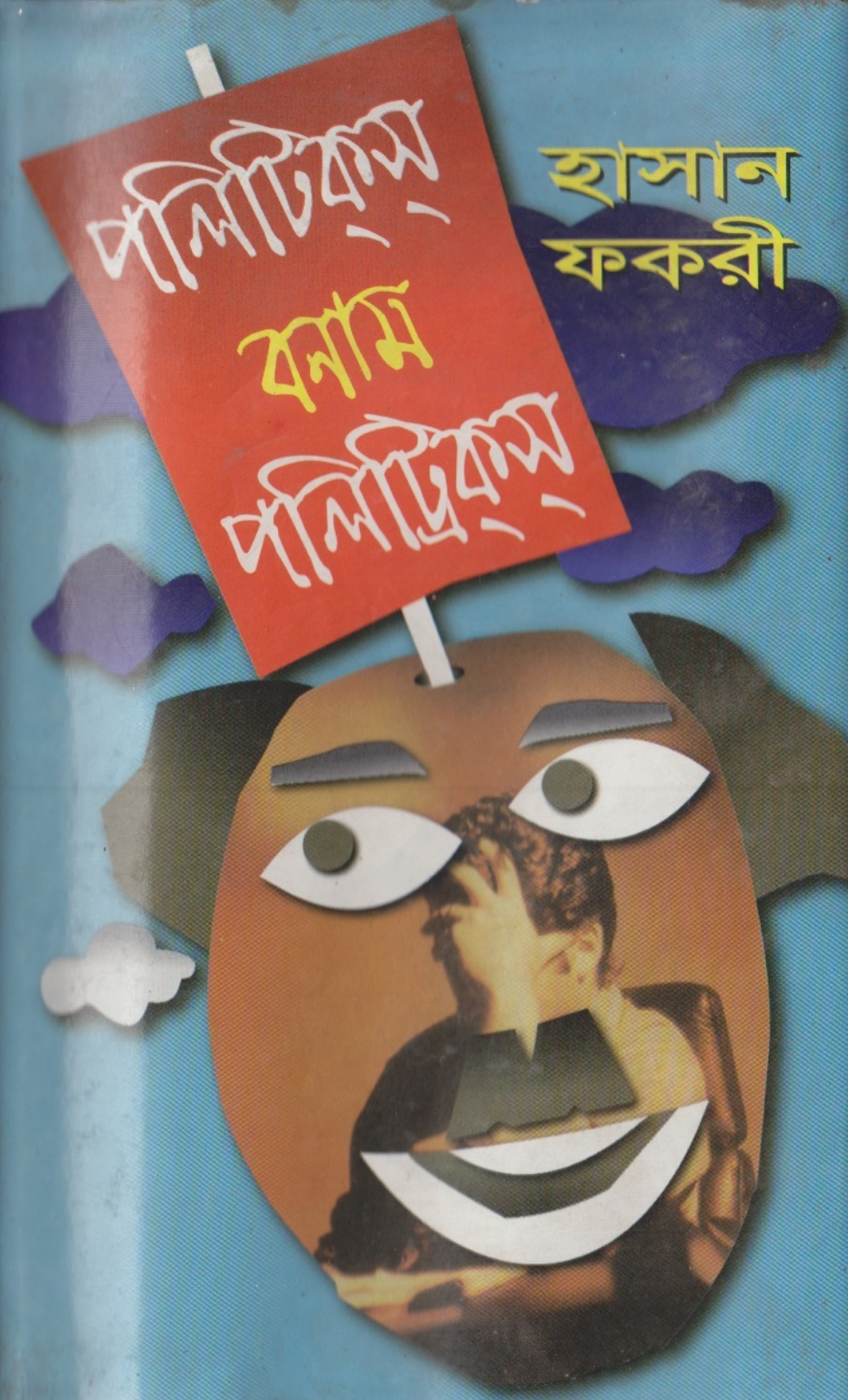

পলিটিক্স বনাম পলিট্রিক্স

হাসান ফকরী

ঘাস ফুল নদী

www.pathagar.com

Politics vs Polytricks

b y

Hasan Fakri

Published by :
Ghas Phul Nadi, 84, Aziz Super Market Shahbag
Dhaka-1000, Bangladesh.
Price : Tk. 80 US $ 8
© লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রকাশকাল : অমর একুশে বইমেলা ১৯৯৯
ISBN 984-8215-21-2
প্রচ্ছদ : সৈয়দ ইকবাল
অক্ষর বিন্যাস : সুবর্ণ কম্পিউটার
৪৮/৫/১, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩
মূল্য : ৮০ টাকা

প্রকাশক : মাহবুব কামরান, মুনীর মোরশেদ। ঘাস ফুল নদী, ৮৪ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

www.pathagar.com

পরিচায়িকা

আহমদ শরীফ

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকেই হল মার্কসবাদের রাষ্ট্রিক বাস্তবায়ন। আর এ শতক শেষ না হতেই বিভিন্ন দেশে তার জরা, জড়তা ও জীর্ণতা দেখতে হচ্ছে। আজ বলতে গেলে কিউবায় ও ফিডেল কাস্ট্রের মধ্যেই কম্যুনিজম ও কম্যুনিষ্ট এ মুহূর্ত অবধি কিছুটা অবিকৃতভাবে দেখা যাচ্ছে। অন্যত্র ব্যক্তিবিশেষে মার্কসবাদ আজো দৃঢ় প্রত্যয়ে, আশায় ও আশ্বাসে টিকে রয়েছে বটে, কিন্তু আন্দোলন, সংগ্রাম ও বিপ্লবী প্রেরণা প্রণোদনা রূপে যেন কোথাও জীবন্মৃত কায়া, কোথাও ছায়া এবং কোথাও প্রাণহীন কঙ্কাল রূপে পড়ে রয়েছে। যেহেতু কোন তথ্যে, সত্যে ও তত্ত্বের মৃত্যু নেই, সেহেতু মার্কসবাদও দুনিয়া ব্যাপী সর্বত্র অসংখ্য ব্যক্তির অন্তরে মর্ত্যজীবনের, জীবিকার ও সমাজ রাষ্ট্রের আধার উৎস ও ভিত্তি প্রতিম, প্রতীক ও প্রতিভূ রূপে বীকন আলোর মতো আশা-আশ্বাসের দীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। তাই মার্কসবাদের মৃত্যু নেই, আজো বিকল্প নেই।

আমাদের বাংলাদেশে মার্কসবাদীর উদ্ভব ১৯২২ সন থেকেই, আর মার্কসবাদী সমিতি গড়ে ওঠে ১৯২৬ সনেই। তবু এ দেশে সিদ্ধি আসেনি। বাঙলায় কম্যুনিজমের সোনার যুগ গেছে ১৯৪০-৬৩ সন অবধি। তারপর থেকে গোটা পৃথিবীর মতো এদেশে কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে মনের, মতের, পথের ও সিদ্ধান্তের পার্থক্য দেখা দেয়, এরপর থেকে ভাঙা-গড়ায় অনেক খণ্ড-ক্ষুদ্র দল বুদ্বুদের মতো গড়ে উঠেছে স্থানীয়ভাবে এবং স্বল্প সময়ে ভেঙেছে আর লুপ্তও হয়েছে। কোন কোন দল আশা জাগিয়েও করেছে শেষাবধি নিরাশ। যেমন বাঙলাদেশে হক-তোয়াহার, মতিন-আলাউদ্দীনের, সিরাজ শিকদারের দল, পশ্চিম বঙ্গে প্রতাপে প্রবল চারু মজুমদারের দল বল-ভরসা জুগিয়েও কোন কূল কিনারার দিশা দিতে পারল না।

এতো ব্যর্থতা দেখে-শুনে-জেনেও আজো দেশে অসংখ্য তরুণ-তরুণী মার্কসবাদে আশা-ভরসা-আস্থা হারান নি। তেমন একজন হচ্ছেন আলোচ্য গ্রন্থের রচক নানা গুণ-গৌরবে ধন্য কম্যুনিষ্ট কর্মী ও কবিতা-প্রবন্ধ লেখক আর জনপ্রিয় নিপুন গান বাঁধিয়ে, নাট্যকার জনাব হাসান ফক্‌রী। জন্ম ১৯৫২ সাল। হাসান ফক্‌রী কোন ব্যর্থতায়, কারো অবহেলায় দমিত ও হতাশ হয়ে হাল ছাড়বার পত্র নন। তিনি মার্কসবাদের বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

সম্ভাবনায় দৃঢ় ও পূর্ণ আস্থা রেখে অবিচল আত্মপ্রত্যয়ী থেকে ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে ছয়চল্লিশ বছর বয়সেও অভীক তরুণের শক্তি ও সাহস আর সংকল্প নিয়ে গানের, কবিতার, নাটকের, প্রবন্ধের মাধ্যমেই নয় কেবল, দেহ-প্রাণ-মন-সময় ও শ্রম দিয়ে জনগণের মধ্যে একজন কম্যুনিষ্ট কমরেড হিসেবে নিষ্ঠার সঙ্গে নিত্যদিন কাজ করে চলেছেন। অকৃতদার এ গুণে-গৌরবে ধন্য ব্যক্তি বলতে গেলে আত্মোৎসর্গই করেছেন মার্কসবাদ কথায়-কাজে ও লেখায় প্রচার ও প্রচারণার লক্ষ্যে। তাঁর প্রয়াসের ফসল অনেক। নেই নেই করেও এ দৈশিক-সামাজিক আকালের কালে এমন মানবপ্রেমিক বিপ্লবী ব্যক্তি আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তিনি তাই আমাদের গর্ব। তাঁর রচিত নাটকের সংখ্যাও এক এক করে অনেক। যেমন- তানোর এখন সারাদেশ, খর বায়ু বয়, যদি এমন হতো, ক্রাশ ফারাক্কা, বাঁচতে চাই, এপোয়েন্টমেন্ট লেটার, সারেঙ লঞ্চ ঘোরাও। তাঁর কবিতার বই মুঠো মুঠো কান্না। গান বাঁধিয়ে হিসেবেই তিনি আমজনতার কাছে প্রিয় ও পরিচিত। নাটকের ও গানের জন্যে তিনি ইতোমধ্যে পুরস্কৃতও হয়েছেন গণপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে। 'চাঁদাবাজ" ছায়াছবির জন্যে গান রচনা করে ১৯৯৩ সনের শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র গীতিকার হিসেবে তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করে দুর্লভ গৌরবে ভূষিত হন।

হাসান ফকরীর নানামুখী গুণের, শক্তির ও প্রবণতার অভিব্যক্তি প্রবন্ধ রচনও একটি। আলোচ্য "পলিটিক্স্ বনাম পলিট্রিক্স্" গ্রন্থে নামে নানা ধরনের লেখা আছে বটে, তবে লক্ষ্যে সব লেখাই পরিণামে অভিন্ন। সবটাই মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পৃক্ত এবং লক্ষ্য জনগণ কল্যাণে সমাজের আধিমুক্তি প্রয়াস। কয়েকটা শিরোনামের উল্লেখেই আমাদের এ মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য প্রমাণ মিলবে। যেমন "আত্মতুষ্টি নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা", "রুখে দাঁড়াও লড়াকু জনতা", "ঝাড়-ফুঁক, মাজার-মসজিদ কালচার", "শ্রমিকের শোষণমুক্তি প্রসঙ্গে", "হে নারী", "প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্কট এবং সম্ভাবনা" প্রভৃতি।

এর থেকে লেখকের যে কেবল দেশ-জাতি, মানুষ, রাষ্ট্র সচেতনতার সাক্ষ্য মেলে তা নয়, তাঁর মন-মগজ, মননের উচুঁমানের ও প্রসারের পরিচয়ও পাই আমরা। দেশের ও আমজনতার স্বার্থেই তাঁর এ গ্রন্থের বহুল পঠন ও প্রচার কামনা করি। এই বই কিনে পড়লে অর্থ, সময় ও শ্রম বৃথা নষ্ট হবে না।

www.pathagar.com

যাঁদের উদ্দেশ্যে

সুন্দরবনের কেওড়ার জঙ্গলে চোরাশিকারীরা যেমন বানরের ডাক নকল করে হরিণকে কাছে এনে বন্দুকের গুলি চালায়; তেমনি অসৎ শঠ ক্ষমতালোভী রাজনীতিবিদরা পলিটিক্সের নামে পলিট্রিক্স অর্থাৎ হরেক রকম চালবাজির মাধ্যমে নৃশংসভাবে বধ করছে অজ্ঞ অসচেতন সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে। অস্বীকার করার উপায় নেই এই পলিট্রিক্স্ (Polytricks) হলো আমাদের রাষ্ট্রাদর্শ। মতলববাজি এই রাষ্ট্রাদর্শের বিপরীতে নিপীড়িত মানুষের বিপ্লবী ধারার রাজনীতি-ই (Politics) আনতে পারে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সার্বিক মুক্তি। বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামের লাল ঝাণ্ডাবাহী সকল কমরেড এর সম্মানে আমার এই বই।

www.pathagar.com

সূচি

ঝাঁড়-ফুক, মাজার-মসজিদ কালচার	৭
আত্মতুষ্টি নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা	১৪
রুখে দাঁড়াও লড়াকু জনতা	২১
আমেরিকা- ক্লিনটন বিষয়ক পাঁচালি	২৭
সরস্বতী বন্দনা	৩১
ছিঃ হাসিনা-খালেদা, ছিঃ বামফ্রন্ট	৩৬
আজকের রূপকাহিনী	৩৮
সমীপে আহমদ শরীফ	৪৫
সংবাদপত্রের চালচিত্র	৫২
হে নারী	৫৯
পরম্পরা মেঘলাদের কথা	৬৩
শ্রমিকের শোষণমুক্তি প্রসঙ্গে	৬৬
খেলাপী ঋণ সমাচার	৭১
আমার বধুঁয়া আন বাড়ি যায়	৭৫
কী চমৎকার দেখা গেলো	৮২
প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্পের সংকট এবং সম্ভাবনা	৯৫
বিদ্রোহের প্রতীক মুমিয়া আবু জামাল	১০৮
দৈর নহিঁ, হরম নহিঁ	১১১
অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ ভালবাসা	১২৪

www.pathagar.com

ঝাড়-ফুঁক, মাজার-মসজিদ কালচার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে মসজিদ মন্দির গীর্জা। বিশেষত: মসজিদের সংখ্যাধিক্যের কারণে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অলংকৃত অপর নাম The City of Mosque বা মসজিদের নগরী। ব্যক্তিগত উদ্যোগে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায়, বিদেশী অর্থ সাহায্যে একদিকে নির্মিত হচ্ছে আধুনিক স্থাপত্য রীতি অনুকরণে নতুন নতুন মসজিদ, অন্যদিকে জরাজীর্ণ পুরাতন মসজিদগুলো সংস্কার সাধন করে কারুকার্য মণ্ডিত করতে ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। পুরাতন ঐতিহাসিক মসজিদগুলোকে নিয়ে অনেক অনেক গল্পকথা, অনেক অনেক কিংবদন্তি।

এসব ঐতিহাসিক মসজিদের অনেকেই মাজার ভিত্তিক মসজিদ। কামেল, পীর, দরবেশ, মুসলিম মনীষী, ধর্মপ্রচারক, শাসক, বাদশা-বেগম বা তাদের পছন্দনীয় মনোনীত প্রিয় ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গের কবরকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছিল সে সব সমাধি বা স্মৃতি স্তম্ভ। যার অনেকই মাজার নামে পরিচিত। এগুলো মসজিদ হিসেবেও ব্যবহৃত হতে থাকে। এ মাজার সামন্ত সংস্কৃতির অঙ্গ। কারো মরণে স্মরণে কবরে স্মৃতি স্বরূপ কিছু নির্মিত হলে গণতান্ত্রিক বা আধুনিক সংস্কৃতিতে বলা হয়ে থাকে স্মৃতি সৌধ, স্মৃতি স্তম্ভ, বড়জোর স্মৃতির মিনার। আমাদের সমাজ ব্যবস্থা যেহেতু সম্পূর্ণরূপে সামন্ত সংস্কৃতির রাহুমুক্ত নয়; তাই কোন কোন হোমরা চোমরা রাষ্ট্র প্রধানের কবর বা স্মৃতি স্তম্ভকে এখনও মাজার নামে অভিহিত করে অহেতুক আত্মতৃপ্তি লাভ করে থাকি। সাম্প্রতিক কালের মাজার বা স্মৃতি স্তম্ভগুলো সম্পর্কে সবাই জানি। কিন্তু পুরাতন বা তথাকথিত ঐতিহাসিক মাজার মসজিদগুলো সম্পর্কে যে বিশ্বাস সংস্কার আমরা পুরুষানুক্রমিক লালন করে আসছি, সেটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত, কেউ কি তা ভেবে দেখেছি?

www.pathagar.com

একটু গভীর ভাবে মনোনিবেশ করলে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, তৎকালীন শাহ্-সম্রাট, নবাব-বাদশা শাসক শ্রেণীর সমর্থন অর্থানুকূল্য বা প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ব্যতীত ওসব বিশালাকার (তৎকালীন সময়ে বিশালাকারই বটে) ইমারত নির্মাণের কথা কল্পনাও করা যেতো না। ইমারত তৈরীর পর সেই প্রাসাদোপম ইমারত, গম্বুজ, মিনার এবং তার বিবিধ অলংকৃত বৈশিষ্ট্য দেখে বিস্মিত হতবাক হতো সাধারণ মানুষের চোখ। কী অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য কর্ম।

বোধ জ্ঞান এবং চিন্তা সীমার বাইরের সব কিছুর মাঝেই মানুষ এক অলৌকিক শক্তির অস্তিত্বকে কল্পনা করে থাকে। আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে অভূতপূর্ব এ কীর্তি নিয়ে বুনে যায় কল্পনার পর কল্পনার জাল। এক এক মানুষ এক এক মনের এক এক প্রতিক্রিয়াকে সংযুক্ত করে দূরদূরান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় সেই বার্তা, সঙ্গে মাজার মসজিদের খাদেম, তত্ত্বাবধায়ক ও অতি উৎসাহীদের মুখে শোনা সমাহিত হোমরা চোমরা ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গের জীবনের অতিপ্রাকৃত বিষয় আশয় এবং মাজারের নানাবিধ অলৌকিক শক্তির কথাও। জনে জনে মুখের পর মুখ বদল হয়ে শোনা-বলা-শোনার তারতম্যে অবশেষে তিল রূপান্তরিত হয় তালে। গাঁ গেরামের সরল প্রাণ মানুষ কৌতুহল বশে আবার কেউ কেউ মিথ্যে প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে অনেক আশায় অনেক আকাঙ্খায় ভীড় জমাতে শুরু করে এসব মাজার মসজিদে। মাজার প্রাঙ্গণে জমে ওঠে মেলা। সে মেলায় বাজার হাট বেঁচা কেনার কত কী আয়োজন। অতিরিক্ত বিনোদনের জন্য ভাবের সুঁতোয় গাঁথা হলো গানের কথার মালা। ঢোল বাদ্যের তালে তালে পরিশ্রান্ত নিরানন্দ মানুষ পেলো অবসর আনন্দের এক চমৎকার আশ্রয়। তথাকথিত শিকড় সন্ধানী বাংলার ফোকলোর গবেষকরা এগুলো বাঙ্গালীর গৌরবময় ঐতিহ্য হিসেবে বিবেচনায় এনে এর নাম করণ করেছেন মাজার সংস্কৃতি। এই মাজার সংস্কৃতি বা মাজার শিল্প নাকি বাংলার মাটি প্রসূত! কিন্তু সত্যিকার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় হানাদার তুর্কী, আফগান, মোঘল মুসলিম শাসকরা তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব সমাধি, স্মৃতি-সৌধ নির্মাণ করেছিলেন। মাজার মসজিদগুলোর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে বাংলার মূল স্থাপত্য ধারার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে বিজাতীয় মুসলিম শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় আরব, পারস্য প্রভৃতি মুসলিম দেশ থেকে আমদানি করা এ মাজার মসজিদ সংস্কৃতি।

সত্যি বলতে কি, এই মাজার সংস্কৃতি বা শিল্পকে বলা উচিৎ হানাদারী সংস্কৃতি, ব্যবসাদারী শিল্প। মাজারের আর্থিক বা লাভজনক বিষয়টি বিবেচনায় রেখে গ্রামে-গঞ্জে, অলিতে-গলিতে, জনপথে-রাজপথে যত্রতত্র গড়ে ওঠে শত শত মাজার। এসব বহু

www.pathagar.com

মাজারেই কবর নেই। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্‌র 'লালসালু' উপন্যাসের কথা অনেকেই জানি। এরকম মাটির ঢেলাকে লাল সালু সবুজ সালু দিয়ে কিছু দিন কবর বানিয়ে রাখতে পারলে মখমল গিলাপের অভাব হয় না আর। জোতদার, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও হার্মাদরা প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে থেকে চুটিয়ে চালাচ্ছেন মাজার ব্যবসা। অনেক সুবিধা এই মাজার ব্যবসার। ট্রেড লাইসেন্স, ট্যাক্স, ভ্যাট, এক্সাইজ নেই। নেই থানা পুলিশের ঝক্কি ঝামেলা। ওপরন্তু বিভিন্ন বিষয়ে পাওয়া যায় প্রশাসনিক সাহায্য সহযোগিতা। জনবিরোধী রাষ্ট্র নিজের স্বার্থেই তা করে থাকে। প্রচারের বদৌলতে গোটা দেশের মানুষ আজ এই মাজার ভাইরাসে আক্রান্ত। রোগ, শোক, অভাব, অনটন, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ সবই যেন কোন এক অশরীরী কালো হাতের থাবা। তা থেকে মুক্তির বা বাঁচার উপায় মাজারে সমাধিস্থ মরে না-মরা অসীম ক্ষমতার অধিকারী কামেল গুরু দরবেশদের পবিত্র আত্মার নেক নজর। তাঁদের ওছিলায় এবং দোয়ার বরকতে দুঃখীর দুঃখ, শোকাতুরের শোক, রোগীর রোগ, পাপীর পাপ ধুয়ে মুছে পরিস্কার। অতএব ছুটো, ছুটে চলো মাজারে বিশ্বাসী মনে। পীর দরবেশদের সান্নিধ্যই দিতে পারে তোমার ইহকাল পরকালের মুক্তি। তাদের সন্তুষ্টির জন্য নিয়ে যাও সিন্নী তবারক। পীর ফকির দরবেশদের সম্পর্কে প্রচলিত মনোহরী অসংখ্য কুদরতির কথা, যা বলে শেষ হবে না।

ভিন্ন ভিন্ন মাজারের ভিন্ন ভিন্ন ফকির দরবেশদের সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন কুদরতির গল্প। সেই মিথ্যে গল্পকে সাজিয়ে গুছিয়ে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্য রূপে দিনের পর দিন প্রচার চালানো হয়। শোষক শ্রেণীর শোষণ প্রক্রিয়া জিইয়ে রাখতে অব্যর্থ এই ধর্মীয় প্রচার প্রোপাগাণ্ডা। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি যুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবে তা-ই মেনে নেয় অজ্ঞ অসহায় সরল মানুষগুলো। সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে রাখতে পারলে এই মানুষগুলো তাদের দূরবস্থার প্রকৃত কারণ যে শোষক গোষ্ঠী তা উদ্‌ঘাটন করতে যাবে না। নিজেদের জীবনের লাঞ্ছনা গঞ্জনা থেকে মুক্তির জন্য মাজার-মসজিদের গণ্ডিতেই ঘুরে বেড়াবে। বছরের পর বছর বংশ পরম্পরায় সাধারণ জনগণ দুরভিসন্ধি মানুষের চক্রান্তে এভাবেই অদৃষ্টবাদের চার দেয়ালে ঘুরপাক খেয়ে মরছে। নিরক্ষরতা অশিক্ষাকে পুঁজি করে গরীব অসহায় লোকদের মধ্যে ধর্মকে আত্মস্থ করাতে মাজার-মসজিদগুলোতে আরো অনেক ফন্দি-ফিকির, আরো বহু ব্যাপার স্যাপার। মাজারের সেবায়েত মোল্লা-মৌলভীদের সম্মোহনী আচার আচারণ। তারা অজ্ঞ অশিক্ষিত নারী পুরুষদেরকে Hypnotism এর মাধ্যমে তুকতাক, ঝাড়ফুঁক, তাবিজ কবচে নির্ভরশীল করে তোলে। তার ওপর ভেকধরা পাগল ফকিরদের অস্বাভাবিক পোষাক-পরিচ্ছদ, খাবার-দাবার, আচার-আচরণও কম

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় নয়। ভাং-গাঁজার মাহফিলও জমে ধূপধুনো দিয়ে। মাঝে মধ্যে খিচুরী মাংস, টাকা কড়ি সদগা দান খয়রাতের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয় ভিক্ষা বৃত্তিকে।

শোষক শ্রেণী কর্তৃক এই মোটিভেশন এর ফলশ্রুতিতে মাজারগুলোতে ভীড় বাড়ছে। বাড়ছে হতাশাগ্রস্ত নতুন নতুন অনুরাগী। এই ভীড় বিশ্বাস সংস্কার অভ্যাসের, এই ভীড় মানসিক বৈকল্যের। নিয়তি নির্ভর মানসিকতায় মাজারে আসেন সন্তান কামনায়, আসেন দাম্পত্য জীবনে সুখ শান্তির আশায়। অসুখে বিসুখে পানি পড়া নিতে, লোটা ঘটি বাটি হাতে লাইনে দাঁড়ান, মাজার মসজিদের দরজায়। মাজার সংলগ্ন খাল বিল বদ্ধ পুকুরও যেন সুধা স্রোতস্বিনী। সেই পবিত্র সুধা স্রোতস্বিনীতে ঝাঁপ দেন মনের দেহের ময়লা দূর করতে। শুধু ওলি আউলিয়া পীর ফকিরই নয়; এই সব পুকুর দীঘির মাছ কুমীর কচ্ছপকে নিয়েও রঙ বেরঙের কিচ্ছা কাহিনী প্রচলিত। যা সবই সত্যের অপলাপ। হযরত বায়েজীদ বোস্তামী (রঃ) এর এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অশরীরী দুষ্ট শক্তিগুলোকে তিনি নাকি আধ্যাত্মিক বলে কচ্ছপ বানিয়ে রেখেছেন, একই রকম গল্প খাঁন জাহান আলীর মাজার সংলগ্ন দীঘির কুমিরগুলোকে নিয়ে। গল্প হযরত শাহজালাল (রঃ) এর মাজারের জালালী কবুতর নিয়ে। দর্শনার্থীরা পূণ্য লাভের আশায় এদেরকে কলা রুটি মাংস খাওয়ান। সরকারী ব্যবস্থাপনায় এই কুসংস্কার লালিত হচ্ছে যুগের পর যুগ। দেশের জাতীয় নেতৃবৃন্দ, সরকার-রাষ্ট্র প্রধানগণ প্রায়শই মাজার জিয়ারতের জাকজঁমক আড়ম্বর অনুষ্ঠান করে থাকেন। বিশেষত নির্বাচন পর্বে মাজার জিয়ারতের হিড়িকে মুখরীত হয়ে ওঠে মাজার প্রাঙ্গণ।

জনবিরোধী সরকার, নেতা, নেতৃবৃন্দ নিজেদের স্বার্থে মিথ্যের বেসাতি মাজার সংস্কৃতিকে রক্ষা করে আসছেন। শোষণের শিকার হয়ে যে মানুষগুলো দিন দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন অত্যাচার নির্যাতনে পিঠ ঠেকেছে দেয়ালে; স্বাভাবিক নিয়মে সকল শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাড়াঁবার কথা। শাসক শোষকরা এই আশংকা উপলব্ধি করেই সাধারণ মানুষ যাতে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের লক্ষ্যে শোষক শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বিদ্রোহে মনোনিবেশ করতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে পীর মাজারের অধ্যাত্মিক কেরামতি ও দয়া দাক্ষিণ্যের নতুন নতুন চাল চালছে চতুরতার সঙ্গে। মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের নিয়ামক কেবলমাত্র মাজার মসজিদের পীর ওলী আউলীয়াদের প্রেমময় সুদৃষ্টি। এহেন গুরু ফকির দরবেশদের আধ্যাত্মিক শক্তির কথা যত ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করা যায় তাই করা হচ্ছে। এই প্রচার প্রাপাগাণ্ডায় আছে শোষক শাসকদের নিয়োজিত এজেন্ট,

www.pathagar.com

রয়েছে মাজার প্রশাসন ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত সমাজ বিরোধী দুর্নীতিবাজরা। দেশের মানুষের দুঃখ কষ্টে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই তাদের। বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস বা মহামারির মত কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ দুঃসময়ে এসব মাজার মসজিদ প্রশাসন কখনো সহানুভূতি বা সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে দাঁড়ায়নি ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে। অথচ ঐ সাধারণ মানুষের দানে অর্থে স্ফীত এ মাজার মসজিদের সঞ্চয় তহবিল। দেশের পাঁচ হাজারেরও বেশি মাজার ভক্তপ্রাণদের দানে অত্যন্ত স্বচ্ছল। পরিসংখ্যানে প্রকাশ বিশটি মাজারের মাসিক আয় এক লক্ষ টাকা থেকে বিশ লক্ষ টাকা। এরকম বহু মাজারের আয়ের সঠিক খতিয়ান পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ কাজ। সাধারণ মানুষের এই দান ছাড়াও আছে আরো অন্য উপায়ে আয়, আছে সরকারী অনুদান। ব্যাঙের ছাতার মত এখানে সেখানে গড়ে ওঠা মাজারগুলোর আয় রোজগারকেও কিছুতেই খাটো করে দেখার জো নেই। ঐ টাকার হিসেব চায় কার এমন বুকের পাটা। বিধবা, এতিম, বৃদ্ধ, শিশু, গরীব অসহায় মানুষ অনাহারে অচিকিৎসায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে, আর মাজার মসজিদের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা পড়ে আছে ব্যাংকে ও অন্যান্য বিনিয়োগ সংস্থায়। ঋণের নামে ওই টাকা যাচ্ছে বড় বড় টাউট ধনীদের পকেটে। যেনতেন ভাবে খরচ এবং ব্যক্তি বিশেষের পকেটে যাওয়ার পরও হাইকোট মাজারের ত্রিশ কোটি টাকা পড়ে আছে ব্যাংকে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য শুধুমাত্র শবে বরাতের এক রজনীতে মীরপুর মাজারে ভক্ত প্রাণদের দান পাওয়া যায় এক কোটি টাকা। এরকম বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দেশের লক্ষ লক্ষ মাজার মসজিদ গুলোর আয় সহজেই অনুমেয়। ধর্মকে পুঁজি করে স্বার্থান্বেষী মহল এসব টাকার সুফল ভোগ করেন। অবশ্য তার কিয়দাংশ ব্যয় করা হয় দেশের সাধারণ মানুষের অশিক্ষা, অন্ধত্ব, কুসংস্কার এবং অদৃষ্ট নির্ভরশীলতা বাড়াবার কাজে। এই ব্যয় খরচের সুফল আমরা দেখতে পাচ্ছি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে। দেখতে পাচ্ছি ব্যক্তিক পারিবারিক জীবনাচরণে।

যেমন ধর্মের নামে ফতোয়াবাজি নারীর ওপর বর্বরোচিত হামলা, ধর্মের নামে কর্মবিমুখতা, সংকীর্ণ অতীত মুখিতা, ধর্মের নামে অধিকার অসচেতনতা, বাক স্বাধীনতা হরণ, ধর্মের নামে সহিংস সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মের নামে ভোট রাজনীতি আরো কত কী! আমাদের অর্থনীতি রাজনীতির ক্ষেত্রে এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্রই এই কুশিক্ষা কুসংস্কারের ভয়াবহতা বিদ্যমান। ধর্ম নয় বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা পৃথিবীর মানুষকে দিয়েছে নিশ্চিত জীবনের আশ্বস্তি। বিজ্ঞানকে অবলম্বন করেই বন্যজন্তু-মানুষ আজ আধুনিক সভ্য-মানুষ। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছে উন্নত থেকে উন্নততর জীবনের দিকে। উন্মোচিত হচ্ছে প্রযুক্তি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের নতুন নতুন অধ্যায়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে

www.pathagar.com

জীনোমিক্স ছাড়াও আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নয়ন সাধন করে বিজ্ঞানীরা আজ মানুষের ক্লোনিং পর্যন্ত তৈরী করতে সমর্থ। আর আমাদের দেশের মানুষ মাজার মসজিদ পশ্চাদপদ সংস্কৃতির প্রভাবে বোতল মগ জগ হাতে দলে দলে ছুটছে সুনামগঞ্জ ডলুরা বিডিআর ফাঁড়ির হাবিলদার নূরুল ইসলামের কাছে, তাঁর স্বপ্নে পাওয়া কেরামতির 'ফুঁ' নেবার উদ্দেশ্যে। হাবিলদার সাহেব নাকি মঞ্চের রাজাসনে উপবেশন করে মাইকে 'ফুঁ' দিয়ে বোতল মগ জগের পানিকে দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ বানিয়ে ছাড়েন। এই হাবিলদার অনেকদিন আল্লাহর নামে দেশের গরীব সরলপ্রাণ অসহায় মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধির অলৌকিক চিকিৎসা করে আসছেন। এবং এই চিকিৎসা করছেন সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিফরম পরিধান করে। সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিফরম চাট্টিখানি ব্যাপার নয়, এ কথা সবাই জানি। অতএব সশস্ত্র বাহিনীর ইউনিফরম পরিধান করে নূরুল ইসলাম সাহেব ঝাড়ফুঁকের যে কর্মটি করছেন তাও চাট্টিখানি কর্ম নয়। হাবিলদার সাহেব তা করছেন সর্বোচ্চ সশস্ত্র কর্তৃপক্ষের গোচরেই শুধু নয়; কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায়ও। প্রতিরক্ষা বিভাগে নিয়োজিত অফিসাররাতো বটেই এমনকি সকল সদস্য জীবন যাত্রায় এবং অন্যান্য সব বিষয়ে বিভিন্ন পেশার মানুষদের চাইতে আধুনিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন অনেক বেশি। সশস্ত্র কর্তৃপক্ষের যদি সত্যি সত্যি এই অলৌকিক চিকিৎসার বিশ্বাস এত মজবুত হয়; তবে তাদেরকে এত এত হাসপাতাল ও অন্যান্য আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা দেয়া যায় কি না তা ভেবে দেখা উচিৎ। দেশের গরীব মানুষের অর্থে রাজস্বে ক্রীত সি, ও, এম, এইচ এর অত্যাধুনিক চিকিৎসার সুযোগ নেয়ার অধিকার অলৌকিক কেরামতি বিশ্বাসী সশস্ত্র কর্তৃপক্ষের আছে কি?

বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়; ক্ষমতাসীন ওপরতলার মানুষেরা সচেতন ভাবেই ঝাড়ফুঁক মাজার মসজিদ সংস্কৃতিকে লালন করছেন। কেউ কেউ অসচেতন বা ধর্মীয় ভাবাবেগের ঘোরে যে করছেন না, তা নয়। তবে ধর্মীয় ভাবাবেগে পড়ে কিছু করে ফেললেও তার কুফল বা ক্ষতিকর কিছু স্পর্শ করার আগেই ক্ষমতার বলে তারা শুধরিয়ে নিতে সক্ষম এবং শুধরিয়ে নেনও। এই শুধরিয়ে নেয়ার রেওয়াজ আজকের নয়, বহু পুরাতন। কিংবদন্তি আছে পুত্র লাভের আশায় হায়দার আলী তার বেগমকে পীরের মাজারের পানি পড়া খাওয়ান। পরবর্তীতে হায়দার আলী পুত্র সন্তান লাভ করলে পীরের নামানুসারে পুত্রের নাম টিপু রাখলেও পুত্র লাভের আশায় হায়দার আলী ও তার বেগম মাজারে যে মানত বা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন নি তারা। হায়দার আলীর শিশু সন্তানের অকাল মৃত্যু হলে প্রতিজ্ঞা ছিলো সুস্থ সবল পুত্র জন্মিলে বাঁচিলে সে পুত্রকে পীরের মাজারের সেবায় সমর্পণ করা

www.pathagar.com

হবে। জাগতিক জীবনাচরণের পরিবর্তে পুত্র বড় হবে ধর্মীয় জীবনানুসরণে। কিন্তু হায়দার আলী অবশেষে তার ভাবানুভূতি শুধরিয়ে নিজের উত্তরসুরী হিসেবে টিপুর ফকিরী জীবন নয়; ফৌজি জীবনকেই অগ্রাধিকার দিলেন। পুত্রকে ফিরিয়ে আনলেন মাজার শরীফের অবাস্তবতা থেকে।

এ প্রসঙ্গে একটি হালকা চালের গল্প মনে পড়লো। এক ভদ্রলোকের দু'বউ; বেশ সুন্দরী। পাশের বাড়ীর অবিবাহিত যুবকের নজর পড়লো দু'বউ এর ওপর। যুবক গোপনে একদিন বড় বউকে প্রেম নিবেদন করে অপমানিত হলো। যুবককে গালমন্দ করে তাড়িয়ে দিলো বড় বউ। অগত্যা যুবক অবশেষে ছোট বউকে প্রেম নিবেদন করে। ছোট বউ লুফে নিলো তার প্রস্তাব। নিরলে নিরজনে দেহ মন সব সপে দিলো যুবকের কাছে। ইতোমধ্যে স্বামী ভদ্রলোকটি একদিন মারা গেলে দু'বউই বিধবা হয়ে যায়। ছোট বউ ভাবে আর লুকোচুরি করে নয়; এবার প্রকাশ্যেই সে ঘর বাঁধবে যুবকের সাথে। যুবক প্রেমিকটি বিয়ে করে বসলো বড় বউকে। যারা গোপন প্রণয়ের কথা জানতো সবাই অবাক। মুরুব্বী গোছের এক লোক যুবককে জিজ্ঞেস করলেন- "বড় বউ তোমাকে যাচ্ছে- তাই গালমন্দ করেছে, কিন্তু ছোট বউ তোমাকে কিছুই অদেয় রাখেনি। তাহলে তুমি ছোট বউকে বাদ দিয়ে বড় বউকে বিয়ে করলে, এটা কেমন কথা?" যুবক জাবাব দিলো "প্রেম আর বিয়ে এক নয়; সম্পূর্ণ আলাদা। বড় বউ পরপুরুষকে গালমন্দ করতে জানে, তাকে বিয়ে করবো নাতো কাকে করবো?" এটাই বাস্তব। ছোট বউ এর সাথে ভাবাবেগে যতযাই করে থাকুক না কেন, যুবক নিজের স্বার্থেই বড় বউকে বিয়ে করবে।

শিশু সন্তানের অকাল মৃত্যুর পর হায়দার আলীর দুর্বল মনের ভেতর যতই ভাবানুভূতির প্রকাশ ঘটুক না কেন, সে তার সুস্থ সন্তানকে উত্তরাধিকারী হিসেবে ভবিষ্যৎ শাসক রূপে ফৌজি শিক্ষায় পারদর্শি করে গড়ে তুলবেন; সেটাই স্বাভাবিক। এখানে আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ধুরন্ধর শিক্ষিত, ক্ষমতাবান মানুষ ধর্মীয় ভাবাবেগের ক্ষতিকর কিছু কিছু বিষয় শুধরিয়ে বা পুষিয়ে নিতে পারেন। অসহায় নিরক্ষর বঞ্চিত সরল প্রাণ সাধারণ মানুষের বেলায় তা সম্ভব নয়। মানব জাতির কল্যাণকামী সুস্থ মস্তিস্কের সকল মানুষেরই উচিৎ মাজার মসজিদ ভিত্তিক অসুস্থ সংস্কৃতি চর্চার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাবে রুখে দাঁড়ানো।

www.pathagar.com

আত্মতুষ্টি নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা?

'বিনা যুদ্ধে নাহি দেবো সূচ্যগ্র মেদিনী' দুর্যোধনের মতই দৌঁড় ঝাপ যুদ্ধংদেহী মনোভাব পরিলক্ষিত হয় অনেক অনেক ব্যক্তি ব্যক্তিবর্গের মধ্যে। পরিলক্ষিত হয় জাতীয় আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে এবং জনগণের বিরুদ্ধে দেশি বিদেশি শাসক শোষকরা যখন নতুন কোন পদক্ষেপ নিতে যায় তখন। বিনা চ্যালেঞ্জ তথা বিনা যুদ্ধে কিছুতেই যেন মেনে নেওয়া যায় না তা। সম্ভবত: মেনে নেওয়ার বিবেকী সান্তনার জন্য সেই চ্যালেঞ্জ সেই যুদ্ধ ঘোষণা।

চ্যালেঞ্জ মানে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম বক্তৃতা-বিবৃতি। যুদ্ধ মানে আলোচনা প্রতিবাদ সভা। সভা শেষ হবার আগেই প্রস্তুত প্রেস-বিজ্ঞপ্তি। আলোচক বক্তাদের আলোচনা বক্তৃতা শুরু না হতেই বক্তব্যের সারবস্তু লিপিবদ্ধ হয়ে যায় দায়িত্বশীল লিখিয়ে কর্মীর তড়িৎ ব্যবস্থাপনায়। বাকী শুধু ফটোকপি। ফটোকপির খরচ এবং ঘুরে ঘুরে পত্রিকায় পত্রিকায় সরবরাহ করার রিক্সা, বেবি ভাড়ার বাজেট পূর্বেই অনুমোদিত। অতএব ছুটো, নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যেই পৌছাতে হবে বার্তা সম্পাদকের হাতে। 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' পত্রিকার পাতার কোনও কোনাকানচিতে মিলেও তো যেতে পারে একটু খানি ঠাঁই। মিলে যায়ও কারো কারো। অবশ্য এর জন্য কম খেসারত দিতে হয় না উদ্যোক্তা আয়োজককে। পত্র-পত্রিকায় বক্তৃতা-বিবৃতি প্রকাশের আগে পরে মিডিয়া রিলেশান মেনট্যান অতি আবশ্যকীয় কর্ম। খালি মুখে কি আর রিলেশান মেনট্যান হয়? সত্যিকার হিসেব নিকেশ করলে দেখা যাবে প্রকাশিত সেই বক্তৃতা-বিবৃতির প্রতি কলাম ইঞ্চির খরচ পত্রিকা মালিক নির্ধারিত বিজ্ঞাপন খরচের চেয়েও কোন কোন সময় বেশিই। তাতে কী! যেখানে গণমানুষের স্বার্থ, জাতীয় জীবনের সুখ-দুঃখ জড়িত, সেখানে টাকা পয়সার চুলচেরা হিসেব নিকেশ হাড় কিপটে আত্মকেন্দ্রীক মানসিকতারই পরিচায়ক। দেশ জাতির দুর্যোগে

www.pathagar.com

দুঃসময়ে জনতার সাথে একাত্মতা, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অর্থাৎ বৃহত্তর মানবিক স্বার্থের কাছে এই খরচ আর তেমন কি?

সারা দেশের কোটি কোটি মানুষ পড়ছে সেই বিবৃতি, দেখছে আমার নাম, জানছে আমি তাদেরই লোক। এমন দায়িত্ববোধ সম্পন্ন এবং এমনই কৃতকর্মের গর্বে গর্বিত সমাজ হিতৈষী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা নেহায়েত কম নয় আমাদের সমাজে।

আমার এক অধ্যাপক বন্ধু আছেন, আছে নাম সর্বস্ব তার একটি সংগঠনও। তাঁর এবং সংগঠনের নামে অদ্যাবধি নাকি চার পাঁচ হাজার বক্তব্য বিবৃতি ছাপা হয়েছে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। যার সকল কপি তিনি আবার যথাযোগ্য মর্যাদায় সংরক্ষণ করে রেখেছেন। জানি না উঁই ও ফ্যাঙগাস মুক্ত রাখতে তিনি ঐগুলোর পিছনে মাসে কত টাকার ন্যাপথলিন খরচ করেন। তবে হ্যাঁ, আমরা অনেকেই তার মতো বক্তৃতা বিবৃতির পেপার কাটিং সংগ্রহে সংরক্ষণে যত্নবান না হলেও এ জাতীয় সভা সেমিনার সিম্পোজিয়ামে কথার ফুলঝুড়ি ছড়িয়ে, নিষ্ফলা পত্র পত্রিকার পাতায় বিবৃতি বিজ্ঞপ্তি ছাপিয়ে আত্মতুষ্টি লাভ করে থাকি। আত্মতুষ্টি নয়; এটাকে আত্মপ্রবঞ্চনা বলাই শ্রেয়। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধি-বৃত্তিধারীদের মধ্যেই এই প্রবণতাটা একটু বেশি। তারা নিজেদেরকে সমাজের সচেতন অগ্রসর মানুষ বলে ভাবেন। পেটি বুর্জোয়া মানসিকতার ঝোঁকে তথাকথিত গতিশীল চাকা বিশিষ্ট প্রগতিশীল রাজনীতির শকটে চলেন। আর তাইতো তারা হাজার বছরের সংস্কার আচ্ছন্ন ভূখা-নাঙ্গা শক্তি-সমর্থহীন-শীর্ণদেহের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর নাগালের বাইরেই থেকে যান চিরকাল।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুকে কাজে লাগিয়ে এই পেটি বুর্জোয়া তথাকথিত সচেতন শ্রেণী যেমন নিজের শ্রেণীকে ডিঙ্গিয়ে জাতে ওঠার কসরত করেন, অন্যদিকে উচ্চবিত্ত এবং বিত্তবানরাও নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় ও আরো উন্নত করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।

দেশ বিদেশের মানুষের সমস্যা নিয়ে বিত্তধারীদের চিন্তা-ভাবনা কর্মকান্ডও কিছু কম নয়। আমাদের দেশে বিত্তধারীদের যেমন পেশাভিত্তিক সংগঠন আছে, আছে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনও। বিভিন্ন পেশার বিত্তধারীরা মিলেমিশে এই সব মিশেল সংগঠন তৈরী করে নিয়েছেন। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠা মানবতাবাদী মুখোশের আড়ালে রক্তচোষা আন্তর্জাতিক সংঘ, সংগঠনের শাখা প্রশাখাও কম নয়। এসব শাখা

www.pathagar.com

প্রশাখা দেশের রাজধানী ঢাকাসহ জেলা থানা এমন কি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিস্তৃত। লায়ন-লিও, রোটারী-রোটারেক্স, অফিসার্স-লেডিস ইত্যাদি ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের কথা আমরা কে না জানি। এগুলো 'রাজভোগ' ক্লাব হিসাবেও পরিচিত।

'বার মাসে তের পার্বণ' আর্থিক দৈন্যতার কারণে আজ আমাদের দেশের গ্রামীণ কালচার থেকে নির্বাসিত হলেও এই সব ক্লাব সংস্থার ব্যবস্থাপনায় ৩৬৫ দিনে ৭৩০টি নানা ছুতার পালা পার্বণে উৎসব মুখর থাকে রাজধানী ও ডিষ্ট্রিক হেডকোয়ার্টারের নামী দামী হোটেল, বল রুম, শো-রুম, উইন্টার গার্ডেন, সামার লজ, রেনি কটেজসহ ছোট বড় মিলনায়তনগুলো। নিন্দুকেরা এসব আচার অনুষ্ঠান গান বাজনা খানাপিনার বিষয় আশয় নিয়ে যত যাই কটাক্ষ করুক না কেন তারা তাদের বিবেকের আয়নায় পরিস্কার। 'পৃথিবী আমারে চায়' গীত প্রভাবে তাদের প্রাণে উছলে ওঠা দয়া-দাক্ষিণ্য পৃথিবীর অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমর্পিত। সারা দুনিয়ার আর্তমানবতার সেবায় নিবেদিত তাদের সকল কর্মকান্ড। ভাগ্যাহত দুস্থ জনগণের সাহায্যার্থে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশে আয়োজিত হয় সুন্দরী রমনীদের খোলা বক্ষের নৃত্য সংগীত সন্ধ্যা। 'রাজভোগ' ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার পার্টি আয়োজনের উদ্দেশ্যও নাকি তাই। এ সকল আচার অনুষ্ঠানের জৌলুস বাড়াতে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রীকেও দেখা যায় চীফ গেস্ট রূপে। শত হলেও দেশের ভাগ্যাহত গরীব দুঃখী মানুষের দুঃখ কষ্ট বিমোচনের মহান উদ্দেশে নিবেদিত লাঞ্চ, ডিনার পার্টি। দুঃস্থ গরীব দুঃখী মানুষের রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান, সরকারপ্রধান হবো; আর তাদের দুঃখ কষ্টের সহমর্মী হবো না তাতো হতে পারে না? এই সহমর্মীরা রাজভোগ খানা পিনার আগে ভূখা জনগণের কষ্ট ব্যথা সমস্যা নিয়ে ওয়াজ-নসিহৎ এবং বুক চাপড়িয়ে কান্নাকাটির ব্যবস্থা করে থাকেন। শুধু শুধু তো আর 'মাছের মার পুত্র শোক' জাতীয় বাগধারা বাংলা ভাষার মাধুর্যকে সমৃদ্ধ করেনি?

তিনশত পয়ষট্টি দিনের সাতশত ত্রিশ বেলার এসব পার্টি, সেমিনার সিম্পোজিয়ামের মঞ্চে আসনে উপবিষ্টদের কুম্ভীরাশ্রু যথাযথ সংরক্ষণ করা গেলে এ কথা নির্ঘাত সত্য যে আরেকটি Bay of Bengal সৃষ্টি হতো এই বাংলাদেশে। অবশ্য একটি বঙ্গোপসাগরের হুংকার গর্জন এবং ঘাত প্রতিঘাতেই ওষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের প্রাণ। এমতাবস্থায় আরেকটি বঙ্গোপসাগরের দানবীয় রূপ প্রত্যক্ষ করতে চায়না বলেই হয়তো নতুন বঙ্গোপসাগর গড়ে তোলার বিষয়টি তারা আমলে নেন না। গণ্ডমুর্খরা এ সবের গুরুত্ব আমলে নিক বা নাই নিক তাতে কিছুই যায় আসে না। এ সব সভা সমাবেশ সেমিনার

www.pathagar.com

সিম্পোজিয়াম ও রাজভোগ পার্টিতে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণে কোনও ছন্দ পতন নেই। বরং 'ধা গেরে না, ধিন গেরে না' তাণ্ডব তালে রাজভোগ সচেতন ব্যক্তিরা কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণের মাধ্যমে অশেষ আত্মতুষ্টি লাভ করে থাকেন।

এবার 'নামভোগ' বন্ধুদের সম্পর্কে যৎকিঞ্চিত নিবেদন। ক্ষুধা দারিদ্র দুর্ভিক্ষ কবলিত নিরক্ষর মানুষের কষ্ট হতাশা-জ্বালা-যন্ত্রণা, গীত-বাদ্য-নৃত্য-গল্প- নাটক-উপন্যাস মোড়কে সুশোভিত বহুজাতিক কোম্পানীর বিলাস দ্রব্য লোসান- ক্রিম-স্নো-পাউডার-সাবান-সেন্ট প্রভৃতির মতো বাজারজাত করছেন সচেতন লিখিয়ে গাইয়ে নাচিয়েরা। সমাজ এবং সমাজের মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধের তাগিদে তাদের এই সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস।

সমাজের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ এই লেখক শিল্পী সংস্কৃতিবানদের প্রশংসা ও স্তুতিতে মুখরিত বাংলা একাডেমী-রমনা বটমূল, গাইড হাউজ-মহিলা সমিতি মঞ্চ, টি, এস, সি -শহীদ মিনার চত্বর, পাবলিক লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র ও বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মিলনায়তন। মননশীল এই কর্মকাণ্ডের জন্য অর্থ, পদকও জোটে কারো কারো ভাগ্যে। শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের ব্যথা-বেদনার চিত্র কারুকার্যমণ্ডিত রূপে ফুটিয়ে তোলা পারদর্শি নাট্যকার, শিল্পী, কবি, গবেষকের সংখ্যাল্পতার কারণে আঙুল গণনায় তারা গণ্য এবং মান্যও বটে।

এই গণ্যমান্য সুধীরা সমাজের দেশের গর্ব, জাতির মনন, সদা সর্বত্র সম্বর্ধিত। গুণীরা চিরকালই রাজদরবারের অলংকার, রাজসভার শোভাবর্ধক। 'বন্যেরা বনে সুন্দর' এর মতো তাদের সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয় বঙ্গ ভবন, গণ ভবনের সবুজ মসৃন লন এবং চক চকে ঝক ঝকে পলিশ সিঁড়িতে। ন্যূনতম এ প্রতিদানটুকু তারা পাবেনই বা না কেন? শাসক শোষকগোষ্ঠী কেবল মেহনতী মানুষের শ্রম ও শ্রমোপার্জ্জিত উদ্বৃত্ত ভোগ করতে পারে; সেই দুঃখী মানুষের দুঃখ ব্যথা বেদনাকে রসোত্তীর্ণ রূপে উপভোগ্য করে তাদের মনোরঞ্জন করার কৃতিত্বতো এই সচেতন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী শিল্পী কলাকুশলীদেরই। অতএব মহৎ শিল্পকর্মের জন্য এই মহানদের আত্মতুষ্টি যথাযথ এবং যুক্তিযুক্ত বটে।

আরেক শ্রেণীর যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক আত্মতুষ্ট নর-নারী আছেন আমাদের সমাজে। 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায় মরি একি তোর দুস্তর লজ্জা' কবি গুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের খোটায় আতে ঘা পেয়ে আদাজল খেয়ে নেমেছেন লজ্জা শরমের মাথা ভাঙতে। তারা প্রচলিত রীতি-নীতি

www.pathagar.com

আচার-প্রথার ধার ধারেন না। বিশেষত: নারী পুরুষ সম্পর্কীত ব্যাপারে তারা অতি-আধুনিক অতি উদার এবং সমকালীন বাস্তবতার একনিষ্ঠ অনুসারী। যৌন বিষয়ে সমকালীন চিন্তা চেতনায় অগ্রগামী গর্বিত বন্ধুরা দিব্যজ্যোতিতে ঝলমল করেন পার্ক-হোটেল-রেস্তোরায়, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে, সাংস্কৃতিক-সামাজিক দল গোষ্ঠীর ঘরে বাইরে, মাঠ ফুটপাথ সর্বত্র। ওপেন এয়ার কনসার্টে উগ্র স্বল্প বসন বসনা এই আধুনিক আধুনিকাদের উন্মত্ততা কারই বা নজর এড়ায়? পাশ্চাত্য নগ্ন সংস্কৃতির ধারক বাহকদের সম্পর্কে পরে এক সময় বলা যাবে; আজ কেবল মাত্র তাদের সম্পর্কেই দু'এক কথা যারা আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতার নামে আদিম পশুবৃত্তিকে যুক্তিসিদ্ধ করতে সচেষ্ট।

তাদের যুক্তি- 'নারী পুরুষ সম্পর্কীত মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন বাস্তবতার পরিপন্থী। এসব মূল্যবোধ রীতি নীতি প্রকৃতিগত নয়; মানব সৃষ্ট। প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের সাথে মানুষের বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। নর-নারী সম্পর্ক, মিলনের আকাঙ্খা প্রাকৃতিক। আত্মীয় অনাত্মীয় ছোট বড় নারী পুরুষের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ে যত বাধা নিষেধ সবই মানুষ আরোপিত। মানুষই সমাজ সৃষ্টি করেছে; তৈরী করেছে রাষ্ট্র। আর ধর্ম! নিছক জুজু'র ভয় ছাড়া আর কিছুই নয়।' অবশ্যই অকাট্য যুক্তি। বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। এরা যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী। এদেরকে খুব তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের চোখে দেখা ঠিক নয়। বিলাসিতার বশে হলেও তাদের অনেকেরই মার্কসীয় দর্শন সম্পর্কে কিছু না কিছু পড়াশোনা আছে। আড়ালে আবডালে কেউ কেউ হয়তো কোন প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সভ্যও থাকতে পারেন। তাত্ত্বিক গুরুর কাছে শিষ্যত্বের নাড়াও বেধেছেন হয়তো। মার্কসীয় দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ বিশ্লেষণের সাথে তাদেরকে পাঠ দেওয়া হয়েছে প্রাণী জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্যের কথা, সমাজ, ধর্ম, শ্রেণী উদ্ভবের ইতিহাস, রাষ্ট্রের তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কেও।

মানব জাতির বির্বতন ধারা এবং সমাজ বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে গিয়ে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে শিখে নিয়েছে নারী পুরুষ সম্পর্কীত বিষয়গুলোকে। সমাজ বিশ্লেষণের অন্যান্য মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে অধ্যয়ন অনুশীলনের ঘাটতি ছিল অনাগ্রহতার কারণে। অনাগ্রহতার কারণ তাদের শ্রেণী চরিত্র। সে যাই হোক, সামাজিক রীতি নীতি অনুশাসন যেমন মানব সৃষ্ট; এই শোষণমূলক সমাজ রাষ্ট্রও মানুষেরই সৃষ্টি। মানব সৃষ্ট শোষণমূলক রাষ্ট্র, সমাজ ভাঙ্গার কাজটিকে বাদ রেখে; শরীর যৌন সম্পর্কীত রীতি নীতি মূল্যবোধের বিরুদ্ধাচরণ করে আধুনিক বিজ্ঞান মনস্ক সচেতন মানুষ বলে আত্মতুষ্টি লাভ; এক ধরনের শঠতা বৈ আর কিইবা হতে পারে?

www.pathagar.com

এবার 'অন-গণ' বিশেষজ্ঞ আতেলদের প্রসঙ্গ। এই আতেল তথা ইন্টেলেকচ্যুয়াল গোষ্ঠী শ্রেণীগতভাবে উচ্চ এবং সুবিধাভোগী শ্রেণীর হলেও বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের লম্বা লম্বা যাদুর কাঠি ডিগ্রির ছোঁয়ায় মানসিকভাবে অন ও গণপ্রেমিক। সামাজিক দায়িত্ব জ্ঞানে স্বত: প্রণোদিত হয়ে অন ও গণ'র প্রেমে অশেষ কায় ক্লেশ স্বীকার করে সারা বাংলাদেশ চষে বেড়ান। টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, দূর্গাপুর থেকে আন্দার চর-চর হরি, পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল, হাওর-বাওর শ্বাপদ সঙ্কুল পথ কোথায় নেই তারা? অবশ্য নির্দিষ্ট সময় মহাকাশে অবস্থানের পর সেন্ট্রাল রিমোট কন্ট্রোলের নির্দেশে মার্কিন মহাশূন্য খেয়াযান যেমন যথা সময়ে কেনেডি স্পেস সেন্টারে অবতরণ করে; সে রকম তারাও কর্ম সম্পাদনের পর যথা সময়ে তাদের স্বস্থান উন্নত অভিজাত এলাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। প্রত্যাবর্তনের পরপরই ব্যস্ত হয়ে যান তাদের প্রিয় অন-গণ সম্পর্কে ঘুরে ঘুরে গৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আধুনিক টেকনোলজির সাহায্যে অন-গণ এর পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট তৈরীর কাজে।

আমাদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ বা সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ছা-পোষা ডাক্তাররা লাশের পোষ্ট মর্টেম করেন বা করতে বাধ্য হন দু'পাঁচশত টাকা ফাও ইনকাম ও চাকুরীর কর্তব্যে। আর উল্লেখিত হাইথট আতেলরা অন-গণ এর পোষ্ট মর্টেম করেন সচেতন মানবিক বিবেকবোধের প্রেরণায়। ডাক্তারদের পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টের দৌড় থানা পুলিশ কোর্ট অর্থাৎ দেশিয় পুঁচকা শাসকদের দুয়ার পর্যন্ত। আর এই ইন্টেলেকচ্যুয়ালদের পোষ্ট মর্টেম রিপোর্ট যায় আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মান অর্থাৎ বিশ্বের বাঘা বাঘা শাসকদের কাছে। ডাক্তারদের রিপোর্ট পিছু দু'পাঁচশত টাকা ফাও রোজগার হলেও; গুরুত্ব অনুপাতে এই আতেলদের রিপোর্ট পিছু আয় রোজগার অনেক অনেক বেশি। তবে তারা আয় রোজগারের বিষয়টাকে উহ্য রেখে মানবিক বিষয়টাই ফলাও করে প্রচার করতে ভালবাসেন। এই প্রচার অর্থাৎ নিজের ঢোল নিজে পেটাতে আয়োজন করেন সভা-সেমিনারের। এসব সভা সেমিনারের পিছনে থাকে বড় বড় দাতা সংস্থা বা আন্তর্জাতিক সংস্থা। ফলে 'যতো গুড় তত মিঠার' মতো এ সভা-সেমিনারগুলো হয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য। মিলে যায় অনগণ দরদী হিসেবে খ্যাতি ও সুখ্যাতি। তবে আয় রোজগারের বিষয় উহ্য রাখলেও তাদের বাড়ি গাড়ি পোষাক আশাক অফিস স্টাফ এবং অন্যান্য এস্টাবলিস্টমেন্ট তো আর উহ্য থাকে না। ওসব দেখে তাদের অর্থ কড়ির বিষয়টা সহজেই অনুমান করে নেয়া যায়।

তারপরও কথা আছে। তাদের আয়-রোজগার বেশি হবেই বা না কেন? অন গণ এর পোষ্ট মর্টেম তো আর বেওয়ারিশ লাশের পোষ্ট মর্টেম নয়, বিরাট ব্যাপার। অন মানে অনুন্নত

www.pathagar.com

অঞ্চল, অনুর্বর ভূমি, অনগ্রসর জাতিসত্ত্বা, অনম্বর আদিবাসী, অনক্ষর মানুষ, অনুপদ জীবনযাত্রা, অনাকাঙ্খিত পরিবেশ, অনাবশ্যক পরিস্থিতি আরো কত কী! আর গণ শব্দের সঠিক ব্যাখ্যার ধারে কাছেও তারা নেই। তাদের গণ মানে পেয়ারের জনগণ। এই পেয়ারের জনগণের সাথে যুক্ত স্বাস্থ্য, বস্ত্র, কর্ম, বসতি, কর্মস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি। এসবের সঠিক যথাযথ পোষ্ট মর্টেম রিপোর্টের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয় দেশি বিদেশি শাসক ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য সহযোগিতার আবরণে শোষণের কৌশল, পরিকল্পিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ গণ-মানুষের শ্রেণী চেতনা বিনাশের পদ্ধতি। গড়ে ওঠে তথাকথিত স্বেচ্ছাসেবী এনজিও গণ সাহায্য, গণ স্বাস্থ্য, গণ উন্নয়ন, গণ শিক্ষার মত অগণন গণ মলসূত্র সংস্থা।

বাহ্ কী চমৎকার! আমরা সচেতন বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিবান সমাজ গবেষকরা অন-গণ এর সাথে এভাবে যথেচ্ছাচার করেই আত্মতুষ্টি লাভ করে থাকি। কী নির্মম পরিহাস বঞ্চিত মানুষের অভাব-অনটন, দুঃখ-কষ্ট, জ্বালা-যন্ত্রনা, শোষণ-নির্যাতন নিয়ে। কী কুৎসিত চেহারা আমাদের সুন্দর মুখোশের আড়ালে। ভয় হয় বিবেকের মুখোমুখি দাঁড়াতে। খুবই অস্বস্তিতে ভূগি কোন কোন সময়। সেই মূহর্তে শুনতে ইচ্ছে হয় ফকির বাউলের এই গান-

"মনে বাবলা পাতার কষ লেগেছে
যায়না ধোলে সাবানে,
মনের ময়লা যাবে কেমনে,
ও গুরু
মনের ময়লা যাবে কেমনে?
ও স্বভাব যায়না ধো'লে
খাসলত যায় না ম'লে (২)
আমার মন পাখিটা ভীষণ চেতা
ও সে তত্ত্ব কথা না মানে॥"

www.pathagar.com

রুখে দাঁড়াও লড়াকু জনতা

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশ ভূমি।
অবাক পৃথিবী আমরা যে পরাধীন
কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন।
অবাক পৃথিবী অবাক করলে আরো
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।
অবাক পৃথিবী অবাক যে বারবার
দেখি এই দেশে মৃত্যুরই কারবার।
হিসাবের খাতা যখনই নিয়েছি হাতে
দেখেছি লিখিত রক্ত খরচ তাতে।
এ দেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম
অবাক পৃথিবী সালাম তোমাকে সালাম।
বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে
আমি যাই তার দিন-পঞ্জিকা লিখে
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।
স্বপ্ন চূড়া থেকে নেমে এসো সব
শুনেছ, শুনছো উদ্দাম কলরব।
নয়া-ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট—

সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতা। কবিতাটি এখন আর আমি আগের মতো পড়িনা। পড়লেও আলোড়িত হই না। জ্বলে ওঠেনা বুকের ভেতর চাপা বারুদ দাউ দাউ করে। ফেটে পড়ি না

www.pathagar.com

ক্রোধ আর উত্তেজনায়। টগবগে ফুটন্ত রক্তের উত্তাপ অনুভূত হয় না এই শরীরে। তবে কি আমি নির্জীব নিঃসাড় জড় কোন পদার্থ? না, তা কি করে হয়? এখনও তো সেভ হলে দাঁড়ি গজায়, হৃৎপিন্ডটা ওঠানামা করে শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে সাথে। তবে, তবে কেন সেই কবিতা, যা আমাকে এক সময় মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিদ্রোহে বিপ্লবে প্রতিরোধে প্রতিবাদে উজ্জীবিত করতো, তা এখন আর আগের মতো আকর্ষণ করতে পারছে না?

মনে পড়ে সেই ষাট সত্তর দশক সর্বোপরি একাত্তরোত্তর দুঃসহ দুঃসাহসিক প্রচণ্ড ভয়াবহ দিনগুলোর কথা। একদিকে শৃঙ্খলিত মানুষের ওপর পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বুলেট বেয়নেট, তারপর তথাকথিত স্বাধীনতা প্রসবকারী বলে দাবিদার আওয়ামী-বাকশালীদের লুটপাট, অন্যায় অবিচার, লাল নীল রক্ষীবাহিনী কর্তৃক নির্যাতন নিপীড়ন, বাক স্বাধীনতা হরণ।

অন্যদিকে সচেতন ছাত্র যুবক শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের প্রতিবাদ প্রতিরোধ সংগ্রাম; গণ মানুষের গণযুদ্ধ গণলড়াই। সেই ভয়াল দুঃসহ শ্বাসরুদ্ধকর সময়ে আমার শক্তি আমার সাহস আমার বেঁচে থাকার প্রেরণা ছিলো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই কবিতা। কারণ এই কবিতার জ্বলন্ত জীবন্ত প্রতীক ছিলো অকুতভয় লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী দেশ প্রেমিক। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাকে আমি প্রত্যক্ষ করতাম উনসত্তর-সত্তরের গণ অভ্যুত্থানে বিষাক্ত বেয়নেটের খোঁচায় ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের সামনে উদ্ধত বক্ষে মিছিলে দাঁড়িয়ে থাকা লড়াকু জনতার অসীম বীরত্বে, একাত্তরে লড়াইরত দেশমাতৃকার সূর্য সন্তানদের সীমাহীন সাহসীকতায়। একাত্তর উত্তর কালে সুকান্তের এই কবিতাকে আমি প্রত্যক্ষ করেছি রাইফেল মেশিনগানের ব্রাশ ফায়ারে ঝাঁঝড়া হয়ে যাওয়া পিছু হাতমোড়া তানোরের বিপ্লবীদের উন্নত, চির উন্নত শিরে ।

কবিতা কিছু কাল্পনিক বর্ণালী শব্দের কুশলী ছন্দ গাঁথুনী নয়, কবিতা সত্য। সেই সত্য ছিলো কমরেড এরাদ আলী, মন্টু মাস্টার। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার সত্য ছিলো কমরেড সিরাজ সিকদার, মনিরুজ্জামান তারা, বাদল দত্ত, বলরাম দাস, তাহের নিজামী, আবুল মাঝি, ডাঃ তুহীন, বদরুল, আতাউর, মান্নান, ওয়াজেদ, নজরুল মাস্টার, কাশিনাথ, হাসান আলী, রাবেয়া আখতার বেলী, রিজিয়া বেগম, পলাশ, খোকন, মনীন্দ্রসহ লক্ষ লক্ষ বীর বিপ্লবীরা।

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদের পোষ্যপুত্র পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী বাকশালীরা বর্বরোচিত পন্থায় নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে মেহনতী মানুষের বন্ধু এসব বিপ্লবী দেশ প্রেমিক নেতৃবৃন্দের ওপর। শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের শ্রেণী শত্রু এই ফ্যাসিষ্টরা বিপ্লবী দেশ প্রেমিকদের নয়; হত্যা করেছিলো আমার সাহস, আমার শক্তি, আমার প্রেরণাকে। হত্যা করেছিলো গণ মানুষের কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের এই কবিতাকে।

তারপর পঁচাত্তর থেকে আটানব্বই। পাকিস্তানী ও আওয়ামী বাকশালীদের জাতভাই সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্থ অনুচর মুস্তাক-জিয়া-সাত্তার-এরশাদ-খালেদা-হাসিনা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল চক্র পালা বদলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থেকে একদিকে জনগণের সম্পদ লুটপাট করেছে; অন্যদিকে বিপ্লবী ও মেহনতী মানুষের ওপর চালিয়েছে জুলুম অত্যাচার। এই দীর্ঘ সময়ে আমরা একটিবারও আমাদের শিড়দাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়ে বলতে পারিনি 'বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে।' কারণ সেই বিদ্রোহ বিপ্লবের প্রতীক কমরেড আসাদ, কমরেড মনিরুজ্জামান তারা, কমরেড বাদল দত্ত ও কমরেড সিরাজ সিকদাররা নেই আমাদের মাঝে। আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় রজবের চাঁদ শাবানের চাঁদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান মিলাদ - মোনাজাতের মতো বিশেষ কিছু দিবস ও জন্ম-মৃত্যুবার্ষিকীর আচার সর্বস্ব হয়েছে আমাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। সেমিনার- সিম্পোজিয়ামের চার দেয়ালে বন্দী হয়েছে জনগণের বিপ্লবী আশা আকাঙ্খা।

একদিকে কবি সুকান্তের কবিতার জীবন্ত প্রতীক বীর বিপ্লবীরা যেমন প্রতিক্রিয়াশীল পশুশাসকদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন, অন্যদিকে বিপ্লবী সংগঠনগুলোতে ঘাপটি মেরে থাকা আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ তাদের এতকালের সর্বহারা শ্রেণীর মতাদর্শ ও বৈপ্লবিক কর্মকান্ডকে ভুল এবং বিভ্রান্ত বলে তথাকথিত আত্মসমালোচনার মাধ্যমে গরীব দুঃখী মেহনতী মানুষের স্বার্থে আত্মোৎসর্গকারী লক্ষ লক্ষ শহীদের রক্তের সাথে বেঈমানী করে অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছেন কোটি কোটি নির্যাতীত নিপীড়িত মানুষের ত্যাগে শ্রমে কষ্টে সাধনায় গড়ে ওঠা শ্রেণী সংগ্রাম ও সশস্ত্র বিপ্লবী ধারাকে।

এদের অনেকেই আজ সাম্রাজ্যবাদের অর্থে পুষ্ট জনস্বার্থ বিরোধী বড় বড় বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলোতে একিভূত হয়ে হাতিয়ে নিয়েছেন নাম-যশ-খ্যাতি, অর্থ-বিত্ত-বৈভব। গুছিয়ে নিয়েছেন নিজেদের আখের। এই আখের গোছানোর

www.pathagar.com

প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ারা 'আম ছালা হারাবার আশংকায় সমাজতন্ত্র সমাজ বিপ্লবের নামাবলি মুখে রেখে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে মূলত: পেটি বুর্জোয়া লাইনকেই তাদের পথ ও পাথেয় করে নামছেন নতুন প্রতারণার খেলায়। বর্তমান শোষণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে স্বীকার করে সেই রাষ্ট্রের তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনের হাটে সেজে গুজে তারা সামিল হচ্ছেন বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের কাছে নিজেদেরকে বেচাঁ বিক্রির দরদাম কষতে। নিষ্ঠাবান, ত্যাগী, দৃঢ়চেতা সাধারণ বিপ্লবী কর্মীরা নেতৃবৃন্দের এইসব হটকারিতায় হতবাক, কেউ কেউ এই হটকারী গোলক ধাঁধার চক্করে পড়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে স্তব্ধ দিশাহীন। সঠিক দিক নির্দেশনা নেই জাতির সামনে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সর্বক্ষেত্রে বিরাজিত এক ঘনঘোর অমানিশা।

কী নৃশংস ভয়ংকর পরিস্থিতির মধ্যে কালাতিপাত করছে এদেশের ছাত্র যুবক শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ীসহ সকল সাধারণ মানুষ। কৃষকের হাঁড়িতে ভাত নেই, শ্রমিকের কাজ নেই, চাকুরীর নিশ্চয়তা নেই, স্কুল কলেজে লেখাপড়া নেই, মা বোনের ইজ্জত নেই, জীবনের নিরাপত্তা নেই, শিশুর ভবিষ্যৎ নেই। এর কোন প্রতিবাদ প্রতিরোধও নেই। ক্ষুধা দারিদ্র আর বেকারত্বের দুঃসহ ঘানি নব্বই ভাগ মানুষের কাঁধে। জোতদার, মহাজন, আমলা-মুৎসুদ্দি, লুম্পেন ব্যবসায়ী, চেয়ারম্যান, এমপি, আর্মি-পুলিশ কর্তৃক তারা প্রতিনিয়ত নিগৃহীত। শেখ মুজিবের লালবাহিনী রক্ষী বাহিনীর প্রেতাত্মা আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে এই বাংলাদেশে। জিয়া-এরশাদের উর্দী সন্ত্রাসী ভূত আজও বর্তমান। খালেদা জিয়ার মুক্ত বাজার অর্থনীতির 'রাইজিং টাইগার' এবং শেখ হাসিনার খাঁচা খোলা ব্যাঘ্রশাবক দল তছনছ করে দিচ্ছে শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্তের বাস্তুভিটা, সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ছত্রছায়ায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের উন্মত্ততার শিকার অগণিত নারী পুরুষ শিশু। শোষক শাসকের রাষ্ট্রযন্ত্র জনগণের গণতান্ত্রিক ন্যায় সঙ্গত আন্দোলন যেমন সার কৃষি উপকরণের আন্দোলন, আনসারদের বাঁচামরার ন্যায্য দাবি, ছাত্রদের উৎপাদনমুখী গণ শিক্ষার দাবিসহ সকল আন্দোলন মোকাবেলা করছে পাশবিক হিংস্রতার মাধ্যমে। প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার বর্বরতায় প্রতিনিয়ত নিহত হচ্ছে অসংখ্য মানুষ। প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদের দালাল ক্ষমতাসীন সরকারী দল প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধীদল এবং বাম নামধারী সংশোধনবাদী দল ও দলের নেতারা নিজেদের স্বার্থে লালন করছে এইসব সন্ত্রাসী কর্মকান্ড। ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও বড় বড় আমলারা নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণের সম্পদ তুলে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর হাতে। আমাদেরই প্রাকৃতিক সম্পদ তেল আর গ্যাসের ওপর আমাদের কোন অধিকার নেই। এই গ্যাস তেল মজুতের মালিক এখন বিদেশের বহুজাতিক কোম্পানীগুলো।

শাসকগোষ্ঠী সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্ব ব্যাংক, আই এম এফ-এর নির্দেশে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারী ছাটাই, দেশের কল-কারখানা বন্ধ, রিক্সা বস্তি উচ্ছেদ এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির নামে দেশ ও দেশের মানুষকে সর্বশান্ত করছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের স্বার্থে জনগণকে ধোকা দিয়ে তথাকথিত সাংবিধানিক অক্টোপাশে আটকিয়ে সুপ্রশস্ত করছে তাদের যথেচ্ছাচারিতার পথ। কোটি কোটি টাকার প্রহসনমূলক নির্বাচনের ফসল আমরা প্রত্যক্ষ করছি বেকারী, দারিদ্র, ধর্ষণ, ঘুষ, দুর্নীতি, চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই ও মত প্রকাশের ওপর নগ্ন হস্তক্ষেপের মধ্যে। ধর্মীয় ফ্যাসীবাদী দল জামায়েত ইসলামী ও ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের সাথে পাল্লা দিয়ে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী শক্তিরূপে আভির্ভূত হচ্ছে তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী স্যেকুলার দল হাসিনা-খালেদার আওয়ামী লীগ বিএনপি। এই সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিষ্টরা ধর্মের নামে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করছে সাম্রাজ্যবাদের মত ও মদদে। জনগণের প্রকৃত সমস্যা থেকে তাদের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করতে এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করে জনগণকে বার বার বোকা বানানো হয়। স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, সংসদ, সংবিধান রক্ষার নামে, ভোট ভাতের অধিকারের নামে অনেক অনেক রক্ত নেয়া হয়েছে। সেই রক্ত, লাল টকটকে রক্তের আলৃতা আজ হাসিনা খালেদার পায়ের শোভা।

এমতাবস্থায় জনগণকে আন্দোলনে বিদ্রোহে সংগঠিত না করে প্রগতিশীল দলগুলো তত্ত্বের চুলচেরা বিশ্লেষণে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে নিষ্ক্রিয় নিরুত্তাপ। ক্যালেন্ডারে চিহ্নিত বিশেষ বিশেষ তারিখে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করে ডায়াসে দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোন মাইকে উচ্চস্বর ধীর লয়ে বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে বিপ্লবী সাজা যায়, এতে বঞ্চিত মেহনতী মানুষকে শোষণের অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। পল্টন, প্রেসক্লাব, শহীদ মিনার, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ফটো জার্নালিস্ট মিলনায়তনে সভা সমাবেশে ঢোলা পাঞ্জাবী কাধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বিপ্লবী সেজে দাবি পেশ ও তত্ত্ব কবচানি অনেক অনেক হয়েছে।

জনগণের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সকল অন্যায় অবিচার জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন। প্রয়োজন "প্রকৃত কৃষকদের হাতে জমি ও বিপ্লবী কৃষক

www.pathagar.com

কমিটির হাতে সকল ক্ষমতা" শ্লোগানের ভিত্তিতে দৃঢ়তার সাথে কৃষি বিপ্লবী সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক এবং মেহনতী মানুষের মধ্যে তীব্র শ্রেণী ঘৃণাবোধ জাগিয়ে চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের কর্মসূচী নিয়ে গণফৌজ ঘাটি এলাকা প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবকামী মেহনতী মানুষকে ভুলে গেলে চলবে না- "বিপ্লব কোন ভোজসভা নয়; উগ্র বল প্রয়োগের কাজ।" এই শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস এবং ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী উৎখাতের জন্য সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশ নেয়াই হবে সত্যিকার সচেতন মানুষের প্রধান কাজ। শ্রেণীচ্যুতি না ঘটিয়ে, উৎপাদন সংগ্রাম ও শ্রেণী সংগ্রামে নিজেদেরকে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত না করে সত্যিকার বিপ্লবী কমিউনিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়।

মেঘে মেঘে বেলা হলো অনেক। আর নয়। অভিমানে অভিযোগে আপাত: নিষ্ক্রিয় ত্যাগী একনিষ্ঠ প্রকৃত বিপ্লবকামী কর্মী সংগঠকদের কাছে উদ্বাত্ত আহ্বান- শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সকল সুবিধাবাদী আত্মসমর্পণকারীদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে আমাদের অকুতভয় যে বীর কমরেডগণ আত্মবলিদান করেছেন তাদের কাঙ্খিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিন শেষ হয়নি। এখনও সময় আছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের দিক নির্দেশনার আলোকে লড়াই শুরু হয়ে গেছে বিশ্বব্যাপী। অতএব ওঠো, জেগে ওঠো, রুখে দাঁড়াও লড়াকু জনতা। জেগে ওঠো সাগরের উত্তাল তরঙ্গের গর্জনে গর্জনে। আবার কণ্ঠে কণ্ঠে কোটি কোটি কণ্ঠে ধ্বনিত হোক-

'বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারিদিকে
আমি যাই তার দিন পঞ্জিকা লিখে।
এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ॥'

www.pathagar.com

আমেরিকা - ক্লিনটন বিষয়ক পাঁচালি

"হস্ত বাইন্ধা দুধ দেয় নারী সে হয় বড় সতী
ঘরের পাশে জাইগা দেখি জন চারি পাঁচ পতি।"

অজ্ঞাত অখ্যাত বাঙ্গালি পাঁচালিকারের এই পাঁচালি-প্রবচনের সাথে আধুনিক সভ্য নাগরিকের পরিচয় নেই বললেই চলে। কিন্তু অজ পাড়াগাঁয়ের মানুষের মুখে মুখে যুগ যুগ ধরে আদি-রসাত্মক পাঁচালি-প্রবচনটি প্রচলিত। এর জন্ম সময় কালের কথা কেউ জানে না। তবে দেশ কাল লিঙের প্রেক্ষাপট আলাদা হলেও বাঙ্গালি পাঁচালিকারের এ কথা আজকের বিশ্বের মহাপরাক্রমশালী দেশ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মহাশক্তিধর প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বেলায় অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

হোয়াইট হাউসের শিক্ষানবিস কর্মী টগবগে তরুণী মনিকা লিউনস্কির সাথে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের যৌন মস্করার ভিডিও টেপ এবং সেই টেপে ধারণকৃত অনেক উত্তেজনাকর বিষয়বস্তু রসনাতৃপ্ত বটিকা হিসেবে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে। চার ঘন্টা সময়সীমা টেপের লিপিবদ্ধ পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১৮৩। স্টারের রিপোর্ট বা ৮ হাজার পৃষ্ঠার পরিশিষ্ট ছাড়াও বহু সংখ্যক দলিল দস্তাবেজ প্রকাশের প্রতীক্ষায়। না, প্রকাশিতব্য সেই সব দলিল দস্তাবেজের অপেক্ষায় নষ্ট করার মতো সময় আর হাতে নেই। দু'একদিনের মধ্যেই লেখাটি প্রেসে দিতে হবে।

ক্লিনটন-মনিকার শৃঙ্গার ক্রিয়ার রগরগে কাহিনী নিয়ে একটি অডিও ক্যাসেটের স্ক্রীপ্ট লিখে দেয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলাম ফালতু কাজ বলে, অথচ এই ফালতু বিষয় নিয়েই আজ আমাকে কলম ধরতে হচ্ছে। কলম ধরবোইবা না কেন? মিডিয়াগুলোর এক তরফা পরিবেশিত অখাদ্য কুখাদ্য আর কাহাতক মুখবুজে হজম করা সম্ভব! ইন্টারনেট এবং

www.pathagar.com

বিশ্বের প্রধান প্রধান টিভি চ্যানেলসহ দেশের ছোট বড় পত্র পত্রিকা সমূহেরও বর্তমান উপজীব্য বিষয় ক্লিনটন-লিউনস্কির পরকীয়া প্রেম। বখে যাওয়া ছেলেমেয়েদের কষ্ট করে বাসষ্ট্যান্ড বা বটতলার বিশেষ বই পত্রের দোকানে লুকিয়ে লুকিয়ে পর্ণো পত্রিকা খুঁজতে হয় না। তাদের সাথে কোমলমতি ছেলেমেয়েরাও ঘরে বসেই সেই সব পর্ণো কাহিনীর সচিত্র প্রতিবেদন পেয়ে যাচ্ছে। এসব পত্রিকায় প্রকাশিত উত্তেজক কাহিনী এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খল অশ্লীল রগরগে বর্ণনার প্রতিক্রিয়ায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশে শুরু হয়ে গেছে যুবতীদের বস্ত্রহরণ। বলাৎকারের স্বীকার হচ্ছে অসংখ্য নারী। সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর সেটেলাইট সাংস্কৃতিক আগ্রাসনে ক্ষত বিক্ষত আমাদের সামাজিক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ। শিশির স্নিগ্ধ শেফালী ফুলের সৌন্দর্য ছেড়ে সকলের চোখের দৃষ্টি আজ ক্লিনটনের বীর্যমাখা মনিকা লিউনস্কির নীল পোষাকটির দিকে। এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবীদের ন্যাক্কারজনক অভিব্যক্তি দেখে শুনে ক্ষোভে ঘেন্নায় গা শির শির করে। এক বিখ্যাত চিত্রনায়ক ক্লিনটনের সাফাই গাইতে গিয়ে বলেই দিলেন- "প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন শুধু আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নন, সারা বিশ্বের প্রেসিডেন্ট।" (মানবজমিন- ২৮-৯-৯৮)। জানিনা কি প্রকারে এই বাঙালি নরাধমের ধমনীতে প্রবেশ করলো আমেরিকার বদ রক্ত। আমরা শোষিত বিশ্বের নিপীড়িত জনগোষ্ঠী। শোষিত লাঞ্ছিত জনগণ যখন আমেরিকার নাম উচ্চারণ করে, তা গালি হিসেবেই উচ্চারিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর কাছে বিশেষ্য নয়; অবগ্যা সূচক বিশেষণ রূপেই পরিগণিত।

বড় নৃশংসতা ও ব্যাভিচারে ভরা আমেরিকার ইতিহাস। ক্রিস্টোফার কলম্বাস সমুদ্র জাহাজে পাল উড়িয়ে ছিলেন ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে। ইন্ডিয়াকে খুজঁতে গিয়ে পথ হারিয়ে ১৪৯২ সালে তিনি খুঁজে পান এক বিশাল বিস্তীর্ন অরণ্য প্রান্তর। যেখানে কেবল আদি মানুষের বাস। কলম্বাসের খুঁজে পাওয়া এই ভুখন্ডে কালক্রমে ঘাঁটি গাড়ে ইউরোপ থেকে পালিয়ে আসা বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো অসভ্য বর্বর লোকেরা। তারা সে ভূখন্ডের আদি অধিবাসীদেরকে মেরে কেটে তাড়িয়ে দখল করে নেয় তাদের জায়গা জমি। প্রতিষ্ঠিত করে নিজেদের ক্ষমতার কর্তৃত্ব। তারপর এই ইউরোপিয়ান রিফিউজিরা আফ্রিকা থেকে জাহাজ বোঝাই করে নিগ্রোদের ধরে এনে ক্রীতদাস বানায়। সপাং সপাং চাবুকের কষাঘাত চালায় বন্দী মানুষগুলোর শরীরে। বাধ্য করে জমি চাষে, ফসল ফলাতে। পশুর মতো মেরে কেটে তাদের দিয়ে গাড়ী টানায়, পাহাড় কাটায়, মাটি খুঁড়ে কয়লা ওঠায়। এসব ক্রীতদাসদের রক্ত ঘামের ফসলে বর্বর ইউরোপিয়ান রিফিউজিরা হয়ে ওঠে বিশাল অর্থবিত্তের মালিক। এ রূপ সহজ অর্থবিত্তের নেশায় তারা আক্রমণ চালায় পৃথিবীর বিভিন্ন

www.pathagar.com

দেশে। সেসব দেশের শস্য সম্ভার ধন সম্পদ লুটপাটের মাধ্যমে আরো স্ফীত করে তোলে নিজেদের সম্পদ ভান্ডার। আমাদের মতো দেশগুলো থেকে লুটে নেয়া সেই অর্থ এবং আধুনিক অস্ত্রসস্ত্রের জোরে তারা নিজেদেরকে বিশ্বে এক নম্বর শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভাগ্যবান মানুষ বলে গর্ববোধ করে থাকে। যেনতেন অজুহাতে যখন তখন আক্রমণ চালায় ছোট ছোট দেশের ওপর। মানবাধিকার লংঘনের কিংবা সন্ত্রাসবাদের দোহাই দিয়ে বোমা ফাটায় সুদান-আফগানিস্তান-ইরান-ইরাক ও আফ্রিকায়। কোরিয়া, জাপান, প্যালেস্টাইন, ভিয়েৎনাম কোথায় নেই তাদের হামলা নির্যাতনের দগদগে রক্তাক্ত দাগ? নিজেরা নৈরাজ্যবাদের শিরোমণি হয়েও সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যবাদের অপবাদ দিয়ে কম্যুনিষ্ট বিরোধী সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে লম্পট আমেরিকা। এসকল এক তরফা জুলুম অবিচারের বিরুদ্ধে টু-শব্দটি করার কেউ নেই। দীর্ঘ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার পতন ঘটিয়ে তারা এখন পৃথিবীর একক একচ্ছত্র কর্তৃত্বের অধিকারী।

মিথ্যে জাল জালিয়াতিতে ভরা এই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অতীত বর্তমান। অথচ শপথ বাক্য পাঠ করে গ্র্যান্ড জুরীর সামনে মিথ্যে বলার জন্য বিল ক্লিনটনকে নিয়ে কত কী তামাসা! ভুতের মুখে রাম রাম জপবুলির মতো মার্কিনীদের মর‍্যালিটি। অবশ্য এ বিষয়ে আমেরিকার সাধারণ জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমরা জানি না। শাসক শ্রেণীর প্রচার মাধ্যমগুলোর প্রতি বিশ্বাস রাখাও মুশকিল। আমরা জানি শোষক শাসক গোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ বিষয়ে অতিমাত্রায় সচেতন। উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুই করে না তারা। এমনও হতে পারে আমেরিকার শাসক গোষ্ঠী কোন অভ্যন্তরীণ সংকটের আবর্তে পড়ে এ জাতীয় নন ইস্যুকে আজ ইস্যু বানিয়ে জনগণের আই ওয়াশ করছে; কিংবা শিকার ধরতে জল ঘোলার ফন্দি ফিকির। আবার ক্ষমতাসীন শাসকদের ক্ষমতার কামড়া কামড়ির অন্তর্দ্বন্দ্বের বিষয়টিও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এ ব্যাপারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দু'বার প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী রস পেলোর ভাষ্য প্রনিধানযোগ্য। রসপেলো বলেছেন- "হয় ক্লিনটনের মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, নতুবা তিনি মাঝে মধ্যে মাদক জাতীয় কিছু গ্রহণ করে থাকেন।" কলম্বিয়া ও রাশিয়ার মাদক পাচারকারী চক্রের সহিত হোয়াইট হাউসের যোগাযোগের কথাও তিনি ফাঁস করে দিয়েছেন। ক্ষমতা কামড়াকামড়ির বিদ্বেষ প্রসূত হলেও মার্কিন ধন কুবের রসপেলোর এই বক্তব্যের যথার্থতা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবু আমরা এদের কাউকেই বিশ্বাস করতে পারি না। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় মার্কিন জনগণের কাছে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের জনপ্রিয়তা বাড়ার সংবাদ। প্রশ্ন জাগে এই জনগণ কোন জনগণ? শ্রমিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল শিকাগোর হে মার্কেট স্কোয়ারের শ্রমিক সমাবেশে যারা বোমা মেরে নৃশংস

www.pathagar.com

হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল এরা কি সেই ষড়যন্ত্রকারী গুণ্ডাদের উত্তরসূরী? কোথায় বিপ্লবী অগাষ্ট স্পাইজ, অ্যালবার্ট পার্সনস? কোথায় প্রতিবাদী অ্যাডলফ ফিশার, জর্জ এঞ্জেল এর উত্তরসূরীরা? যাদের রক্তের বিনিময়ে সারা দুনিয়ার শ্রমিক অর্জন করেছে আট ঘন্টা শ্রমের অধিকার।

ফোর্ড-রকফেলারের মতো পুঁজিপতিদের এক চেটিয়া মালিকানা বিকাশের সেই যুগে আমেরিকার শ্রমিকদের অবস্থা ছিলো অত্যন্ত শোচনীয়। বিভিন্ন কল কারখানার মালিকরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করিয়ে শ্রমিকদের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাতের মাধ্যমে ফুলে ফেপে বাড়ছিলো। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা ও দিক নিদের্শনার আলোকে বঞ্চিত শ্রমিকরা সংগঠিত হয়ে আট ঘন্টা শ্রমের দাবি নিয়ে শুরু করে আন্দোলন। ধর্মঘটে ধর্মঘটে অচল হয়ে যায় কারখানার চাকা। শ্রমিকদের সেই উত্তাল সংগ্রামের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে যায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। এমনি অবস্থায় প্রতিবাদী শ্রমিকদের প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে হত্যা খুন করতে তখন মালিক পুঁজিপতিরা মিলে গড়ে তোলে পিংকার্টন এজেন্সী নামে একটি কোম্পানী। এই কোম্পানীর গুন্ডাবাহিনী শ্রমিকদের ওপর যে সন্ত্রাস, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিলো সেই একই সন্ত্রাস হত্যাযজ্ঞ আজ সংগঠিত হচ্ছে দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক। অতএব আজকের আমেরিকাকে পিংকার্টন এজেন্সী কোম্পানীর আধুনিক নব সংস্করণ বলা যায় নির্দ্বিধায়। এই কোম্পানীর গুন্ডাবাহিনী প্রধান বিল ক্লিনটন এখন সত্য, ন্যায় নিষ্ঠ, শান্তির অগ্রদূত, মানবতাবাদী, বিশ্বদরদী ইত্যাদি ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত পূত-পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মুখোশধারী। এই মুখোশ উন্মোচনে কেনেথ ষ্টার বা গ্র্যান্ডজুরীর হাজার হাজার পৃষ্ঠার লম্বা লম্বা বয়ানের দরকার নেই। নিবন্ধের শুরুতে গন্ডমুর্খ বাঙালি পাঁচালিকারের উল্লেখিত প্রবচনটিই যথেষ্ট। এই পাঁচালি-প্রবচনের গেঁয়ো গীতিভাষ্য বুঝতে যাদের অসুবিধে তাদের জন্য এর সহজ সরল গদ্য ভাষ্য হলো এই- "অন্যের নিকট নিজের সৎচরিত্র প্রমাণের জন্য পতিপরায়না নারী সন্তানের দু'হাত বেঁধে বুকের দুধ খাওয়ায়। সন্তান যেন বুকে হাত লাগিয়ে সতীর স্তনের পবিত্রতা নষ্ট না করতে পারে। এ বক্ষে হাত দেয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর পতি বা স্বামী দেবতার। কী সাংঘাতিক পতিপরায়না সতী নারী। অথচ মজার ব্যাপার রাতের অন্ধকারে সেই নারীই স্বামীর অগোচরে গোপনে গোপনে চার-পাঁচ জন পুরুষকে সঙ্গ দিয়ে থাকে।" সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, মানবিকতার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং মার্কিনীদের বড় বড় বুলির এটাই হলো অন্তর্নিহিত সারবস্তু।

www.pathagar.com

সরস্বতী বন্দনা

জানা যায় রূপ থেকে রসের উপজয়। দেহজরূপ মানুষের স্নায়ুতে যে প্রতিক্রিয়া ঘটনায় তা থেকেই জন্ম হয় রসের। রসের পরবর্তী পর্যায় ভাব। ভাব থেকে ভালবাসা। দেবতা সরস্বতীর নজর কাড়া টগবগে দেহজরূপ যদি শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন এর প্রাণে রসের সঞ্চার করে থাকে, তা থেকে প্রেমে গদ গদ হয়ে মকবুল ফিদা হুসেন সরস্বতীকে বস্ত্রহীনতো করতেই পারে। (অবশ্য সরস্বতীর সম্মতিক্রমে। তবে সরস্বতীর অসম্মতির কোন কথা আমরা জানি না।) এটাই স্বাভাবিক। না, এই স্বাভাবিক রসলীলায় বাঁধ সাধলো ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা। ভারতের ডানপন্থী হিন্দু উগ্রজাতীয়তাবাদীরা তাদের দেবতা সরস্বাতীর নগ্ন ছবি আঁকার অপরাধে অভিযুক্ত করেছে ভারতীয় জনপ্রিয় মুসলিম শিল্পী মকবুল ফিদাকে। শুধু অভিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি, এই বিখ্যাত শিল্পীর অমূল্য চিত্রকর্ম তারা চিতাভস্ম করেছে সংঘবদ্ধভাবে স্বউল্লাসে। দেবতা(!) সরস্বতীর উলঙ্গ ছবি আঁকার তীব্র বাসনা এবং এই ছবি নিয়ে ফিল্মী ষ্টাইলে মারদাঙ্গার বিষয়টি চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকে আলোড়িত না করে পারে না। ১১ই অক্টোবর শুক্রবার টাইমস অর ইন্ডিয়ায় পরিবেশিত খবরে বলা হয়- "হিন্দু মৌলবাদীদের সংগঠন বাজরং দলের সদস্যরা বৃহস্পতিবার আহামদাবাদে একটি আর্ট গ্যালারীর রক্ষীকে বন্দী করে মকবুল ফিদা হুসেনের (৭৪) ২৫টি ক্যানভাস এবং ২৮টি ট্যাপোষ্ট্রি পুড়িয়ে ফেলে। তারা শিল্পী ফিদা হুসেনের সকল চিত্র প্রদর্শনী বন্ধ করে দেয়।" জানিনা এ নিয়ে ভারতের উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীরা আরো কত কি তুলকালাম কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, ভারতবর্ষের ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে ওঠেছে দারিদ্র, অশিক্ষা, কুসংস্কারের জলকাদা আলগা জমির ওপর। যা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। তাইতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অহরহ সংক্রামিত হতে দেখি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ম্যালেরিয়া মহামারী। সাম্প্রতিক ভোটবাজী শঠ রাজনীতিবিদদের ষড়যন্ত্রে রাম মন্দির না বাবরি মসজিদ, হিন্দুত্ব না মুসলমানত্ব এই প্রশ্নে বলির পাঠা হলো

www.pathagar.com

লক্ষ লক্ষ মা বাবা ভাইবোন বন্ধু স্বজন। গঙ্গার মিঠা স্বাদের পানি, যা পদ্মা যমুনায় বহমান, সে পানিতে বাংলাদেশের মানুষও অনুভব করলো মনুষ্য রক্তের লোনা স্বাদ। অসম্ভব নির্মম নিষ্ঠুর সে স্মৃতি। না, এ প্রসঙ্গে আমি যাচ্ছি না, শুধু বিস্মৃতির ধুলো অপসারিত করে সাম্প্রদায়িকতার সেই লোমহর্ষ ভয়াবহ স্মৃতির কথা আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিলাম। এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। ভারতের জনপ্রিয় বিখ্যাত বর্ষিয়ান চিত্র শিল্পী মবকুল ফিদা হুসেন। এই শিল্পী তার মননশীল আধুনিক শিল্প কর্মের জন্য শুধু ভারতেই নয়, পাশ্চাত্য বিশ্বেও সুপরিচিত। নতুন শিল্প কর্ম উপস্থাপনার ক্ষেত্রে তার অসামান্য পারদর্শিতা রয়েছে। শিল্পী ফিদা হুসেনের বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত শিল্প মানস বিকাশে জাতি-ধর্ম-বর্ণের সংকীর্ণতা কোন বাধা হতে পারে নি।

সমাজের প্রথাগত ইতিহাস ঐতিহ্য রীতিনীতি বিশ্বাস অবিশ্বাসকে বিচার বিশ্লেষণ ছাড়া হুবহু মেনে নেয়া কোন সৎ সৃষ্টিশীল শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব নয়। শুধু শিল্পীর কেন সকল মানুষেরই অধিকার রয়েছে নতুন কিছু ভাবার, নতুন কিছু করার। পৃথিবী সৃষ্টির হাজার হাজার বছরের ইতিহাস পুরাতনকে বর্জন, নতুনকে আলিঙ্গনের ইতিহাস। আত্মসচেতন অনুসন্ধিৎসু শিল্পীর চোখতো অনুক্ষণই নতুনকে খুঁজে বেড়ায়। পরিবর্তনশীল পৃথিবীর সব কিছুর মত তার শিল্প কর্মও একটি পরিবর্তনশীল ব্যাপার। নতুনতর সৃষ্টির মধ্য দিয়ে শিল্পী বর্তমান অবস্থা থেকে ভিন্নতর অবস্থায় পৌঁছে যান, সমাজকে সচল গতিময় করে তোলেন। ঐতিহ্যের অচলায়তন ভেঙ্গে চূরে নির্মাণ করেন বাসোপযোগী আলো বাতাস খোলা নতুন এক ঐতিহ্য। অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিরাজমান ধর্ম, দর্শন, শিল্প সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিলো পূর্বতন ধর্মদর্শন শিল্প সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষের ওপর। প্রচলিত রীতি নীতি ও শিল্প ফরম বা আঙ্গিক একজন সৃজনশীল শিল্পীর চিন্তায় ও কাজে প্রয়োজনীয় নাও হতে পারে। তার স্বাধীনতা রয়েছে এ সবের পরীক্ষা নিরীক্ষা করার। এই স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপের অর্থ সমাজ সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরী। সচেতন শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানেন এই ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্ম, ধর্মাচার, বিশ্বাস, রীতিনীতি অন্ধকুসংস্কারাচ্ছন্ন জটাজুটধারী সাধু সান্ত, পরগাছা দাঁড়ি টুপি সুরমাওয়ালাদের নিয়ন্ত্রণাবদ্ধ। তারা যুগোপযোগী চিন্তা চেতনার বিপক্ষ শক্তিই শুধু নয়, স্বর্ণোজ্জ্বল আলোক রশ্মির পথ রুদ্ধকারী। অতএব সচেতন মানুষ মাত্রেরই উচিৎ ধর্মোন্মাদ অজ্ঞ ঐতিহ্যমুখী লোকদের ক্রিয়াকর্মকে বিরোধীতা করা এবং সচেতন শিল্পী, শিল্পকর্মীর সময়োপযোগী সৃষ্টি কর্মকে স্বাগত জানানোর।

www.pathagar.com

ফিদা হুসেনের আঁকা হিন্দুদেবীর নগ্ন ছবির ক্যাপসন কি ছিল জানি না। ওপরোক্ত বিষয়ে পত্রিকায় সংবাদের শিরোনাম লেখা- "দেবতার নগ্ন চিত্র।" একেতো কল্পিত দেবতা, যার কোন অস্তিত্ব নেই; তার আবার নগ্ন ছবি। বেশ মজার ব্যাপারই। কল্পিত দেবতার বাস্তব নগ্ন ছবি, এ কি কম অভিজ্ঞতা? তেতাল্লিশের মন্বন্তরে আমার জন্ম হয়নি। সে সময় পথে ঘাটে শিয়াল কুকুরের সাথে কল্পিত দেবদেবী নয়, ঘুরে বেড়াতো বুভুক্ষ মানুষের দল। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতা আমার হয়নি। তবে সেসব চিত্র আমি দেখেছি। তুলির রঙে পেন্সিলের রেখায় ইস কি ভয়াবহ দৃশ্য। হাড্ডিসার নগ্ন মানব মানবীর মর্মান্তিক সে চিত্র হৃদয়কে ধাক্কা মারে। ভাবি ঐতিহ্যমুখী ধর্মের ধ্বজ্জাধারীরা সেদিন কোথায় ছিল? সে নগ্নতার পক্ষে বিপক্ষে মিছিল মিটিং ভাংচুরের প্রশ্ন ওঠেনি তখন। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষকালীন সময়ের মতো না হলেও আজও রাস্তাঘাটে নগ্ন মানুষের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। মানব জাতির নগ্নতা বিমোচনের চেষ্টা না করে, কল্পিত দেবীর নগ্নতায় জিঘাংসু হয়ে মৌলবাদীরা মাঠে নেমেছে ত্রিশুল হাতে। মৌলবাদীদের বাড়াবাড়ি দেখে ধারণা করা যায় সম্ভবত রক্ত মাংসহীন অবচেতন দেবতার নগ্ন ছবি তাদের মনে কামনা জাগাতে সক্ষম নয়। তারা রক্ত মাংস গড়া অসাধারণ দেহ সম্পদের অনাবৃত নারীদের দেখায় পাওয়ায় ভোগে অভ্যস্ত। "শরীরিনীর ভরাট যমজ পাহাড়ের মত স্তন, ক্ষীণ মাংসল বর্তুল মধ্যদেশ, গুরু নিতম্ব" তো সর্বদাই দেখছেন। ব্রিজিত বার্দো, মাধুরী দীক্ষিত, কারিশমা, মনিষা কৈরালা, শ্রীদেবীর উর্বর পুষ্ঠ শরীর থেকে কাপড় খসে গেলে উনারাতো বাহবা মারহাবা বলে লম্প মারে। চলচ্চিত্রের সচল ছবির নায়িকা তার পরনের শার্টটি মাথার ওপর তুললে এই ধর্মভীরু ভদ্রেলোকদের চোখে পড়ে শরীরিনীর গাঢ় রংগের স্পোর্টস ব্রা। তারপরও আছে.....। অতএব এত কিছুর পর স্থির পাথর মূর্তির বা দেবীর নগ্ন ছবি তাদের কামনা বাসনার আনন্দে অতিরিক্ত আর কতটুকুইবা দিতে পারে?

এখন দেব দেবীদের চিত্র প্রসঙ্গ। সেই প্রাচীন কাল থেকে পৌরাণিক দেবদেবীর দৃশ্যাবলী ভারতীয় চিত্রকরদের অন্যতম প্রধান উপজীব্য ও অবলম্বন। ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে ছবির কোন অন্ত নেই। ছবির বিষয় বস্তু হয়েছে- "শ্রীকৃষ্ণ গোপিনীদের লীলা", "স্নানরতা রাধার বস্ত্র হরণ", "শিব বক্ষে কালীমাতা", "সন্তান সন্ততি পরিবৃতা মা দূর্গা", "আধুনিক গণেশ দেবতা", "কুরুক্ষেত্রে ভীষ্মের শরশর্যা", "রাবনের সীতা হরণ", "হনুমান দেবতার লঙ্কা জয়", "শিবলিঙ্গ" থেকে শুরু করে কত কি। ওসব ছবিতে কুশলী শিল্পীরা শরীরবিদ্যার খুটিনাটি তুলে ধরেছেন সুনিপুণ ভাবে।

www.pathagar.com

এখন প্রশ্ন, লৌকিক দেবতার নগ্ন ছবি ফিদা হুসেনই কি এই প্রথম আঁকলেন? না, নগ্ন ছবির ইতিহাস আরো আগের। গুহাবাসী মানুষ যখন পাথর ছুঁড়ে শিকার ধরতো, তখন থেকেই আদিম মানুষ জীবজন্তুর সাথে সাথে তাদের কল্পিত দেবদেবীর রূপারোপ করেছে পাহাড়ের গায়ে, শিলায় শিলায়। সে সব দেবদেবী বা ঈশ্বর ঈশ্বরীর চিত্র সবই নগ্ন। তখন বস্ত্রের কোন ধারণাই ছিল না। বস্ত্র বা পরিধেয় আবিষ্কার করতে মানুষের বহু যুগ লেগেছে। আজও ভারতের অজন্তা, ইলোরা, কোর্নাক, মহাবলী, পুরমের নগ্ন দেবতাদের ছবি এই সাক্ষ্যই বহন করে। নগ্ন দেবদেবীর চিত্র অঙ্কিত উক্ত স্থানসমূহ ধর্মানুরাগিদের তীর্থভূমি। সেই নগ্ন দেবতাদের লজ্জা ঢাকার জন্যে মৌলবাদীরা কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন? নগ্নতা তো দূরের কথা, প্রাচীন বহু মন্দির উপাসনালয়ে মৈথুন, সংগমরত মূর্তি এবং খোদাই করা ছবি রয়েছে ভুড়িভুড়ি। আবেগময় উত্তেজনাকর সে ছবি। যা যৌন উন্মত্ততার সৃষ্টি করতে পারে। জানিনা শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে দেবতা সরস্বতীর নগ্ন চিত্র এঁকেছেন। তবে গতানুগতিকতার বাইরে এসে তিনি যে তাঁর শিল্প কর্মে নতুন কিছু দেখাবার সাহস করেছেন তার জন্য তিনি প্রশংসিত হয়েছেন সগোত্রীয় শিল্পী এবং শিল্পবোদ্ধাদের কাছে। হিন্দু মৌলবাদীরা এ নিয়ে যতই লাফালাফি করুক, সত্য সততঃ প্রকাশিত।

দেবতা সরস্বতীর পৌরাণিক সত্যটি কি, এই দেবীর আবির্ভাব কোথা হতে কি ভাবে ক্ষ্যাপা ত্রিশূলধারীরা জানেন কি? হিন্দু দেবতা সরস্বতী সম্পর্কে বেশ কটি মিথ প্রচলিত। সরস্বতীর উৎপত্তি আবির্ভাবের বিবরণও এক এক পুরাণে এক এক রকম। শ্রীমদ ভগবত পুরাণে দেখা যায়- বিশ্ব স্রষ্টা ব্রহ্মার মন থেকে বাক নাম্নী মনোহারিণী এক কন্যার জন্ম। ব্রহ্মা এই অপরূপ সুন্দরী কন্যার রূপ লাবণ্যে অভিভূত হয়ে কন্যার পানি গ্রহণের কামনা করেন। কিন্তু কন্যা ক্ষুব্ধ মনে পিতার কামনাকে প্রত্যাখ্যান করে। এই মনোহারিনী কন্যাই সরস্বতী। সরস্বতী সম্পর্কে সারদা মঙ্গল কাব্যের বিবরণ অন্য রকম- "মুনী বাল্মিকীর তথোবন। বৃক্ষের ডালে বসে ক্রৌঞ্চ ক্রোঞ্চী আনন্দে খেলা করছে। হঠাৎ ব্যাধের নিক্ষিপ্ত বাণ বিদ্ধ হয়ে ক্রৌঞ্চ মাটির ধুলোতে লুটিয়ে পরে। সাথীর মুত্যুতে ক্রন্দন রোল তুলে ক্রৌঞ্চী। তা দেখে করুণা সিক্ত হয় মুনী বাল্মিকীর কোমল হৃদয়। সে মুহূর্তে বাল্মিকীর ললাট দেশে আবির্ভূত হলেন এক জ্যোতির্ময়ী কন্যা। ক্রৌঞ্চীর ক্রন্দনে উতলা হলেন তিনিও। করুন সুরে বেজে উঠলো তার হাতের বীনা। বাল্মিকীর ললাট মন্ডলে আবির্ভূতা করুনা রূপিনীই হলো বীণাধারী সরস্বতী। তারই প্রভাবে বাল্মিকীর করুন কণ্ঠে করুন

www.pathagar.com

রসের ব্যঞ্জনাময় শ্লোক 'মা নিষাদ'। এবার দেখা যাক ব্রহ্ম বৈর্বত পুরাণে সরস্বতীর আবির্ভাব সমন্ধে কি লেখা। ব্রহ্ম বৈবত পুরাণে উল্লেখ- "কৃষ্ণের মুখ থেকে এক কন্যা আবির্ভূত হলেন, তিনি বীনা পুস্তক ধারিনী সরস্বতী। ইনি আবির্ভূত হয়ে কৃষ্ণকেই কামনা করলেন। কৃষ্ণ তা দেখে সরস্বতীকে বললেন- রাধাই আমার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী। সে যেন বিষ্ণুকে গ্রহণ করে। বিষ্ণুর আরো দুই স্ত্রী বর্তমান। তারা হলেন লক্ষ্মী ও গঙ্গা। এবার হলো তিনজন- লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা। একদিন গঙ্গা সকামা হয়ে বিষ্ণুর মুখে তাকাতেই বিষ্ণু গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হাস্য করলেন। লক্ষ্মী তা সহ্য করলেও সরস্বতী ক্রোধাবিষ্ঠা হয়ে বিষ্ণুকে তিরস্কার করতে ছাড়লেন না। এ ছাড়া নিজেকে প্রেম বঞ্চিতা দুর্ভাগা বলে ধিক্কার দিলেন। অতপর সরস্বতী লক্ষ্মী গঙ্গা কলহ বিবাদে জড়িয়ে পরস্পরকে অভিশাপ দিলেন।" এই হলো দেবতা সরস্বতী সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী।

অন্য বিশ্লেষণে ইতিহাসবেত্তারা বলেছেন- সরস্বতী বস্তুত বৈদিক যুগের একটি বিখ্যাত নদী। সরস্বতী-সরস+বতু, স্ত্রী লিঙ্গে ঈ প্রত্যয় যোগে সরস্বতী। যার অর্থ-জলবতি নদী। বঙ্গীয় কবিদের বন্দনায় পরবর্তীতে সরস্বতীর নদী রূপ হারিয়ে যায়। বর্তমানে সরস্বতীর পৌরাণিক রূপ এবং তার কাল্পনিক গুণাবলীর স্তুতি বন্দনার নানান আচার আয়োজন। এই বন্দনার রীতি নীতি পদ্ধতিতো এক এক জনের কাছে একেক রকম হতেই পারে। মকবুল ফিদা হুসেন একজন শিল্পী। আমরা ধরে নিতে পারি এই যশস্বী শিল্পী সেই বন্দনার জন্যই সরস্বতীকে বিবস্ত্র করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য মানসে যেমন উপলব্ধি ঘটিয়ে ছিলো চাঁদের আলো, ফুলের সুবাস-

"চাঁদের আলোকে ভরে নাগো মন
দেখিতে চাই যে চাঁদ
ফুলের গন্ধ পাইলে জাগে যে
ফুল দেখিবার সাধ।"

www.pathagar.com

ছিঃ হাসিনা - খালেদা, ছিঃ ব্রাম্ফ্রন্ট

কথায় বলে এক কান কাটা লোক চলে রেখেঢেকে, আর যার দু'কানই কাটা তার আবার কিসের রাখঢাক? তিনি চলেন খুলে মেলে, বুক ফুলিয়ে। সম্প্রতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলসমূহের হম্বিতাম্বি বক্তৃতা বিবৃতি কর্মকান্ড তাদের নির্লজ্জ চেহারাকে পরিস্কার করে ফুটিয়ে তুলেছে জনগণের সামনে। নাক কান কাটা শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া, মিজান চৌধুরী, গোলাম আযম, মেনন সহ তথাকথিত বাঘা বাঘা নেতা নেত্রীবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের দোসরদের সম্মুখে নিজেদেরকে পুরোপুরি উলঙ্গ করে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূত, কমনওয়েলথ প্রতিনিধি ও বিশ্ব ব্যাংক প্রধানের কাছে গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণে যে দল যে পার্টি শীর্ষে সেই দল সে পার্টিই আমাদের ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল রাষ্ট্রের প্রায় ১২ কোটি মানুষের কর্তৃত্বের মালিক। এই মালিকানা প্রতিষ্ঠাকে বিশ্বাসযোগ্যতা দেয়ার জন্য কোটি কোটি লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে গণতন্ত্রের নামে আসে ভোটের তথা নির্বাচনের তামাসা। এই তামাসা আয়োজনে গণবিরোধী রাষ্ট্রযন্ত্র, দুর্নীতি পরায়ণ প্রশাসন থেকে শুরু করে চরিত্রহীন জাতীয় দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্রিকা, যাদুর বাক্স রেডিও-টেলিভিশনের এলাহী কাণ্ড কারবার। এই সাথে যুক্ত হয় পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন। মিছিল মিটিং সভা সমাবেশতো থাকেই। দেশের মানুষ মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য ভুলে যায় তাদের দুঃখ দুর্দশা, কষ্ট, ব্যাথা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনার জ্বালা। ভুলতে হয় শোষক নিপীড়কদের শোষণ নিপীড়ণের কথা। সাধারণ মানুষের নিরানন্দ একঘেয়েমী জীবনের ফাঁকে এই যে, সামান্য একটু বৈচিত্রতা; তারওবা মূল্য কম কিসের? অশিক্ষা, অজ্ঞতা এবং সচেতনতার অভাবে চমকানো ঝলকানো প্রোপাগান্ডায় দিশেহারা না হয়ে কি উপায় আছে? বাঘের থাবায় ক্ষত বিক্ষত জীবন বাঁচাতে ঝাপিয়ে পড়ে হাঙ্গরের মুখে। সবাই জানে নির্বাচনে যারা এমপি মিনিস্টার হবে তারা সবাই বড় বড় চোর, নামজাদা ডাকাত। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কায়দা কৌশলে তারা লক্ষ লক্ষ টাকা বানিয়েছে। কখনো ক্ষমতায় থেকে, কখনো ক্ষমতাসীনদের সহযোগিতায় দেশের, জনগণের সম্পদ লুট করে বিপুল অর্থ

www.pathagar.com

বৈভবের মালিক হয়েছে তারা। ঘুরে ফিরে সবাই সরকারে এসেছে। তাদের ফাঁকা বুলি মিথ্যা আশ্বাসের বাণী ভাঙ্গা রেকর্ডের মত বেজেই চলে ঘ্যানর ঘ্যানর। এই ক্ষমতাবান দল ও দলের সমর্থন পুষ্ঠ বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গের অদক্ষতা, অযোগ্যতা, দুঃশাসন এবং সীমাহীন দুর্নীতি সন্ত্রাসের কাছে জিম্মী পঁচানব্বই ভাগ ভোটার। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস। তবু নির্বাচন এলে তাদেরকেই ভোট দিঁতে হয়। ভুল হচ্ছে জেনেও অনেক সময় ভুলটাকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এটা এক ধরনের Optical Illusion অর্থাৎ চোখের ভুল।

ইদানিং বহুল উচ্চারিত প্রচারিত কটি শব্দ- সংবিধান, সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা, সাংবিধানিক সরকার, সংবিধান মোতাবেক শাসন। এই সব আপ্ত বাক্য উচ্চারণে লুটপাটকারী দল সমূহের ঘোড়দৌড় ১২ কোটি মানুষ অধ্যুষিত বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জ, হাট বাজার, শহর নগর বন্দর, বাস্তুভিটাকে তছনছ করে দিচ্ছে। সাধারণ মানুষের আয় রুটি রোজগারের ওপর হিংস্র থাবা বিস্তার করছে আর একটি রাক্ষুসী কালো হাত- মুক্ত বাজার অর্থনীতি। কারো আর জানতে বাকী নেই যে, দাতা গোষ্ঠীর ছদ্মাবরণে সাম্রাজ্যবাদ, বৃহৎ বাণিজ্যিক সংস্থা বিশ্ব ব্যাংক- আই, এম, এফ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অনুন্নত দেশের রাজনীতি, অর্থনীতির লাগামে টান- ঢিল দিয়ে অধোনত দেশগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রেখে লুটপাটের রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তথাকথিত সংবিধান গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী দলগুলো ওপরোক্ত জাতীয় এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকান্ডের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে নির্লজ্জ কর্মসূচী ঘোষণা দিয়ে ভোটের বাজারে নামে। তারা ভোট বিক্রেতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থান সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তাই কেউ ভোট নিলেন অস্ত্রের জোরে, কেউ টাকার বিনিময়ে, কেউ বিসমিল্লাহর ছদ্মাবরণে, আবার কেউ মাথায় কালো পট্টি বেঁধে দু'হাত তুলে মোনাজাতের অভিনয় করে। নিরক্ষর, অজ্ঞ, অর্ধশিক্ষিত এবং ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন এদেশের মানুষ বার বার এভাবেই ঠকেছেন এবং ঠকছেন। তবে সুখের কথা শেখ হাসিনার কালো টাকা কালো পট্টি, খালেদা জিয়ার সন্ত্রাস বিসমিল্লাহ্‌র মত ভুয়া বামফ্রন্টের তথাকথিত সমাজতন্ত্রের কচকচানি নির্বাচনী জেতার কৌশল হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ হাসিনা খালেদার কাছে প্রতারিত হলেও তারা প্রত্যাখ্যান করেছে এ ভুয়া সমাজতন্ত্রীদের। তথাকথিত বামফ্রন্টের বন্ধুদের প্রতি আহবান- বন্ধুগণ, আয়নায় নিজেদের চেহারাটা একবার দেখুন, আর লজ্জা শরমের কথা ভাববেন না। জনগণ দেখে ফেলেছে আপনাদেরও নাক কান বলে অবশিষ্ট কিছু আর নেই। অতএব প্রকাশ্যে গণশত্রুদের দলে যোগ দিন। দোহাই আপনাদের, সমাজতন্ত্রের কথা বলে বিপ্লবী বাক্যবাগীশ হয়ে জনগণকে আর বিভ্রান্ত করবেন না। বর্তমান প্রতিক্রীয়াশীল রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র তথা মুক্তি প্রতিষ্ঠা ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

www.pathagar.com

আজকের রূপকাহিনী

এই কিছু কাল আগের 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা'র শাহেরজাদী বেগম খালেদা জিয়া এখন নতুন রূপ-রঙ-ঢঙে হ্যামিলনের বংশিবাদকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। না, বেগম খালেদা তাঁর বাঁশিতে সঠিক সুরটি এখনও বাঁধতে পারেন নি; যে সুর মূর্ছনায় আবেগ আপ্লুত জনতা জড়ো হয়ে আবার তাঁকে পৌঁছে দেবে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে। তবে স্বার্থক বংশিবাদক শেখ হাসিনা মনমোহন বাঁশিতে জনগণকে মোহগ্রস্ত করে দীর্ঘ আরাধ্য গন্তব্যে অধিষ্ঠিত হয়ে আরব্যোপন্যাস 'এক হাজার এক রজনী'র শাহেরজাদী বর্ণিত রূপকাহিনীকেও হার মানাচ্ছে। রূপ কাহিনীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এতে সম্ভব অবসম্ভবের বালাই নেই। মানুষের মাথাকাটা গেলেও সে নির্বিবাদে হেঁটে যায়, একজন বীর খেয়ে ফেলতে পারে বিশ মন খাবার, ছুঁড়ে মারতে পারে হাজার মন ওজনের পাথর। অতিপ্রাকৃতিক আরো কত কী ঘটনার ছড়াছড়ি আমাদের লোক কাহিনীকে ঘিরে। রাজকুমার অভিযানে গিয়ে ভুল বশত: পথ হারালে তাঁর পথপ্রদর্শক রূপে হাজির হয় শুকপাখি, যাত্রাপথে পাহাড়া দেয় অরণ্য-দেও, নৃত্য গানে মনরঞ্জন করার জন্য পরীরাজ্যের অপ্সরীরাতো আছেই। আর যদি ভাগ্যগুণে জুটে যায় তপস্যামগ্ন দরবেশ কিংবা সন্নাসীর আশির্বাদ; যাদুস্থান, রাক্ষসের দেশ, আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত, সাগর-পাহাড় দুস্তর দুর্গম প্রান্তর সবকিছুই অতিক্রম করা যায় অনায়াসে অবলীলাক্রমে। এসব লোক কাহিনীর সাথে বাস্তবতার কোন রকম সামঞ্জস্য না থাকলেও বর্তমানে নানাবিধ সংকটের আবর্তে নিমজ্জিত বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণের সংকট নিরসনে আজকের 'আলেফ লায়লা ওয়া লায়লা'র শাহেরজাদী শেখ হাসিনা, তাঁর পথ প্রদর্শক শুকপাখি পাচাটা সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী এবং তাঁকে পাহাড়াদার অরণ্য-দেও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মসূচি কর্মপন্থার প্রস্তাব, প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগে লোক কাহিনীর মটিভগুলো বিদ্যমান ও

www.pathagar.com

সুস্পষ্ট। উদ্দেশ্য একটাই; প্রকৃত সমস্যাকে আড়ালে রেখে জনগণকে এক ঐন্দ্রজালিক ভাবের রাজ্যে নিয়ে যাওয়া।

যখন গল্প শোনার বয়স, তখন গ্রামে একটি প্রবাদের সাথে পরিচিত হয়েছিলাম। প্রবাদটি 'যত মুশকিল তত আসান।' আজ এই মধ্যবয়সে এসে সবকিছু দেখে শুনে মনে হচ্ছে সত্যি এত মুশকিল অর্থাৎ এত সমস্যা সংকটের দেশ দুনিয়াতে বোধ হয় খুব কমই আছে। আর যদি থেকেও থাকে তবে হলফ করে বলা যায় যে সেসব দেশ, দেশের মানুষের বিদ্যমান এত এত হাজার লক্ষ কোটি কোটি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার এমন সহজ সরল পথ আমাদের দেশ ছাড়া আর কোথাও নেই। এ বিষয়ে আরো গভীরে মনোনিবেশ করলে দেখা যাবে জনগণের মূল সংকট বা মুশকিলকে পাশ কাটাতে নতুন নতুন কিছু সংকট আরোপিত হয়। গুরুত্বের বিবেচনায় সেই সংকট সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ কর্মসূচির স্থান চলে আসে শীর্ষে। জনগণের এসব সমস্যা ও সমাধানের নামে ক্ষমতাসীন দলগুলোর (সরকার ও বিরোধী) মধ্যে চলে মজার 'সাপ লুডু' খেলা। সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রাতের আধাঁরে ক্রিসেন্ট লেকের বেইলী ব্রিজটি তুলে প্রধান বিরোধী দলকে দীর্ঘদিন সংসদ বর্জনে সহায়তা দিয়ে তথাকথিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নড়বড়ের মহা (!) সংকট তৈরীর মাধ্যমে পাবলিকের মগজ কব্জা করে রাখলেন বেশ ক'মাস। শেষমেষ স্পিকারের বাসায় নেতাদের দফা দফা খানাপিনার বৈঠকে 'ডুবে যায় যায়' গণতন্ত্রের তথা দেশের মানুষের বাপদাদা চৌদ্দগোষ্ঠী যেন উদ্ধার হলো মাত্র চার দফা চুক্তির মাধ্যমে। পত্রপত্রিকার লিডিং হেড লাইনে এলো প্রকল্পিত ধারাবাহিক অন্যান্য বিবিধ সংকট। সংকটের গান যদি বাজে বিলম্বিত একতালে; তার সমাধানের সুর শুনি দ্রুতলয় ত্রিতালে। না, তবুও শেষ নেই সংকটের। হায়রে সংকটের কী শ্রী! সংসদে কোরাম সংকট, স্পিকারের উদ্দেশ্যে কিলঘুষি পাকানো, ফাইল, মাইক ষ্ট্যাণ্ড ছোঁড়া, টিভির ক্যামেরা ভাঙ্গা, ওয়াক আউট, সংকটের কী শেষ আছে? শেয়ার বাজার ধ্বস পড়া সংকট, রেডিও টেলিভিশনের স্বায়ত্বশাসন দেওয়া না দেওয়া সংকট, রাস্তা-ঘাট, পুল, ছাত্রাবাস, ষ্টেডিয়াম, বিমান বন্দরের নাম পরিবর্তন পরিমার্জন সংকট, জাতির পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর নাম পুনরুদ্ধার সংকট। সংকট স্বাধীনতা ঘোষক বেঘোষকের, সংকট জিন্দাবাদ চিরজীবীর। এ জাতীয় যত বেশি সংকট বা মুশকিল জনগণের ওপর আরোপ করা যাবে, ফায়দা লুটতে ততবেশি আসান পাবে শোষক গোষ্ঠী ও তাদের চামচারা। এ প্রসঙ্গে বড় ফিরিস্তি না এনে সাধারণ মানুষের বোধগম্যের জন্য নমুনা স্বরূপ নিম্নে বর্ণীত দু'চারটি উদাহরণই যথেষ্ট বলে মনে হয়।

www.pathagar.com

১. বাংলাদেশের গ্রাম তথা গ্রামের মূল অর্থনীতি কৃষিউৎপাদন ব্যবস্থা; যা আজও সামন্তবাদী অর্থনীতির সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। সমাজে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত কৃষি উৎপাদনের সাথে জড়িত কৃষকরা জোতদার মহাজন ও ফটকাবাজ ব্যবসায়ীদের শোষণের শিকারের ফলে দিন দিন ভূমিহীনে পরিণত হয়ে বিকল্প জীবিকার সন্ধানে আজ জড়ো হচ্ছে শহরে। শহর পরিণত হচ্ছে জনারণ্যে। স্বাভাবিক কারণেই বাড়ছে ঠেলাগাড়ি, রিক্সা, টেম্পো, স্কুটার, বাস। বাঁচার আশায় দু'মুঠো ভাত জোগার করতে হকার, ফেরিওয়ালা ও ভাসমান শ্রমিক বেছে নিচ্ছে রাস্তা এবং ফুটপাথ। এ ছাড়া সরকারী আধা সরকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের বরাদ্ধকৃত 'ফাও' গাড়ির পাশাপাশি উপরোক্ত কর্মকর্তা, আমলা ও ভূইঁফোঁড় ব্যবসায়ীদের ষ্ট্যাটাচ সিম্বল লুটের টাকায় প্রাইভেট কার মটর যানের সংখ্যাও বাড়ছে অগণিত হারে। এ সবের সাথে রাস্তা রাজপথের রাজা স্বীকৃত সরকারী চাঁদাবাজ ট্রাফিক পুলিশ সার্জেন্টদের দায়িত্বহীনতার কারণে যানজট এখন প্রাত্যহিক বিষয়। এই যানজট সংকটকে উপলক্ষ্য করে বড় ধরনের মওকা হাতিয়ে নিলেন শোষক শাসক দল। যানজট সংকট সমাধানের জন্য যেন তাদের 'নিদ নাহি আঁখি পাতে।' এই যানজটের প্রকৃত উৎস, কারণ এবং তার সঠিক সমাধানের ধারে কাছে না গিয়ে এর প্রতিকার কল্পে একদিকে রিক্সা, হকার উচ্ছেদের ফতোয়া দিলেন, অন্যদিকে সরকারের গণবিরোধী কার্যকলাপ ও অন্যান্য বিভিন্ন অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে জনগণ যেন রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল সমাবেশ করতে না পারে তারই লক্ষ্যে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেন। যানজট সংকট সমাধানের নামে দিনে দুপুরে হাইজ্যাক করা হলো এদেশের মানুষের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার।

২. "বেসরকারী খাতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন কম, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদের চাকরী ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে টিকে থাকতে হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষারমান নিশ্চিত করতে হবে।" অর্থাৎ বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা মানের দারুন সংকট বিদ্যমান। বিষয়টি জোরে শোরে আলোচিত হয় ১৬ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশনে। সরকার নিযুক্ত ভাইস চ্যান্সেলর সিনেট চেয়ারম্যান প্রফেসার এ, কে, আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এই সংকট সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তি ফি কমপক্ষে দশ হাজার টাকা ধার্য করার এবং অনতিবিলম্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ব্যক্তি মালিকানায় অর্থাৎ চুরি ডাকাতি লুটপাটের মাধ্যমে যিনি বিপুল টাকার মালিক হয়েছেন তাঁর হাতে তুলে দেয়ার প্রস্তাব করলেন কোষাধ্যক্ষ সাহেব। সত্যি কী চমৎকার সমাধান।

www.pathagar.com

৩. সরকারী দলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত তিনটি ছাত্রাবাস তাদের সশস্ত্র ছাত্র ক্যাডাররা দখলে নেয়ার পরপর বিরোধী দলের ছাত্র ক্যাডারগণ যখন সংঘর্ষে লিপ্ত হলেন সরকারী দলের ক্যাডারদের সঙ্গে, তখনই সরকারী দলের প্রধান শেখ হাসিনা ছাত্রদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চোখ খুলে দেখলেন, শিক্ষাঙ্গনের মূল সমস্যা ছাত্রদের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চিহ্নিত করে তড়িৎ গতিতে অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী দেখামাত্র গুলী করার প্রস্তাবও দিয়ে ফেললেন অবলীলাক্রমে। অবশ্য শেখ হাসিনা তাঁর এই প্রস্তাবের ব্যাকগ্রাউণ্ড পূর্বেই প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। সেই ব্যাকগ্রাউণ্ড প্রস্তুতে তাকে সাহায্য দিয়েছিলেন তাঁরই নিযুক্ত ঠুটো জগন্নাথ রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের পক্ষে মন্তব্য বিবৃতি প্রকাশের মাধ্যমে। শাসক গোষ্ঠী তাদেরই আরোপিত এই সংকট সমাধানের নীল নকশা কার্যকরী করতে পারলে; সকল অন্যায় অবিচার, জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে দেশপ্রেমিক সচেতন ছাত্র সমাজ জনগণের অধিকার আদায়ের রাজনৈতিক চেতনায় শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে গণ সংগ্রামকে আর সুসংগঠিত করতে পারবে না।

৪. রূপকাহিনীর কল্পাবিহীন মানুষের মতো দেশের অর্থনীতি শিল্পনীতি হেঁটে যাচ্ছে বীর বিক্রমে। আমাদের সরকার তার পূর্ববর্তী সরকারগুলোর মতো মুক্তবাজার অর্থনীতির নামে অবাধ বাণিজ্য নীতির ধারালো চাকুতে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মাথা কেটে শিল্পস্বয়ম্বর দেশ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন মহাগোরস্থানের দিকে। এই সরকার নিষিদ্ধ পণ্যের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ায় এবং বারবার শিল্পনীতি পরিবর্তন করায় জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো রুগ্ন হতে হতে আজ মৃতপ্রায়। দফায় দফায় টাকার অবমূল্যায়ন করছে কোরামিন ইনজেকশান হিসেবে। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ফলে একদিকে যেমন হাজার হাজার শ্রমিক বেকারত্বের দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছে; অন্যদিকে ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক ও ব্যবসায়ী সম্প্রদায় সহায় সম্বল হারিয়ে এখন পথের ফকির। শোষক শ্রেণীর সরকার এই সংকট নিরসনের নামে রাষ্ট্রীয় শিল্পসমূহ বিরাষ্ট্রীয়করণসহ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর স্বার্থে পরামর্শে আজগুবি পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যস্ত। প্রশাসনিক কূট-কৌশল ও পুলিশি জুলুম অত্যাচারে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন তৎপরতা প্রায় বন্ধ, ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখন শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার। বিভিন্ন দলীয় সরকারের রাজত্বকালে সেই দলের এবং অসৎ ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগাসাজসে ব্যাংকের কোটি কোটি টাকা লুটপাট হয়ে ব্যাংক সমূহে সৃষ্টি করা হয়েছে গোঁজামিল অর্থ সংকট। পাঁচ হাজার টাকা ঋণ গ্রহীতার ঋণ বদহজমী ও পাঁচশত কোটি বা তারও বেশি কোটি কোটি টাকা ঋণ গ্রহীতার ঋণ হারামী মিলিয়ে ব্যাপকতর হয়েছে ঋণ খেলাপী

www.pathagar.com

কালচার। এই সংকট নিরসন কল্পে ভগ্ন অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের নামে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হলো ঋণ খেলাপী মোকদ্দমা। ব্যাংক কর্মকর্তা ও ব্যাংক কর্মচারীদের হয়রানির শিকার হয়ে বদহজমের ঋণ খেলাপীরা আজ লুকিয়ে বেড়ায়। অথচ প্রজেক্ট এপ্রাইজাল করার সময় যে সকল ব্যাংক কর্মকর্তারা দায়ী, তাদের প্রমোশন হচ্ছে; তারা ঢাকায় বড় বড় বাড়ি গাড়ির মালিক, লণ্ডন আমেরিকায় লেখাপড়া করছে তাদের ছেলে মেয়েরা। আরো মজার বিষয় বেক্সিমকোর মতো কিছু বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান, যাদের সাথে সরকারী উচ্চপর্যায়ের গোপন লেনদেন সন্তোষজনক, তাদের ঋণ পুন: তফসিল করে কোটি কোটি টাকার বকেয়া ঋণ মওকুফের ঘোষণা দিয়ে সরকার এসব শিল্প কারখানা ও এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত কর্মচারীদের অস্তিত্ব ও জীবিকা সংকটের সুরাহা করলেন অতিবেশি মহানুভবতার নামে।

৫. সমগ্র দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ভয়ংকর ও ভয়াবহ। দুর্নীতিপরায়ণ ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে আজ চরম সংকট। এই সংকট ষড়যন্ত্রমূলকও বটে। সংকটের যথপোযোগী বাস্তব সমাধানের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করে সরকার বিদ্যুৎ খাতকে ব্যক্তি মালিকানায় তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। সেই ষড়যন্ত্রের বর্হিপ্রকাশ লোড শেডিং, বিদ্যুৎ গ্রীড বিপর্যয় ইত্যাদি ইত্যাদি। ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে জনগণের 'আই ওয়াসের' জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রীকে প্রথমত অপসারণ করে সরকার দেখালেন- দেখো তোমাদের জন্য আমরা কি না করতে পারি? না, তাতেও পার পাওয়া গেলো না। বিদ্যুতের দাবিতে সারাদেশ ব্যাপী প্রচণ্ড ক্ষোভ বিক্ষোভ ঘেরাও সমাবেশ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এখন দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিদ্যুৎ বিভাগের সকল অফিস, সাবষ্টেশন, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে পুলিশ, বিডিআর কোথাও কোথাও সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছেন; তাদের নির্দেশ দিয়েছেন জনগণের ক্ষোভ বিক্ষোভকে কঠিন হস্তে মোকাবেলা করার। এই সুযোগে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বিদেরকেও বিদ্যুৎ কেন্দ্র আক্রমণ করার অজুহাতে শায়েস্তা করা যাবে। বাহ্ কী সুন্দর আইনী সমাধান!

৬. আইনী শাসনের দেশে বেআইনী শিশু, নারী ধর্ষণ, পাচার, খুন, বেআইনী হেরোইন-ফেন্সিডিল-হোমিও মিথাইল সেবনে গণমৃত্যু ইত্যাদি ইত্যাদি আজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এই জাতীয় ঘটনাসমূহ যত বড় যত বেশি বর্বোরোচিত হোক না কেন সরকারের কাছে তার প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন খুবই স্বাভাবিক এবং তুচ্ছাতি তুচ্ছ বিচ্ছিন্ন বিষয়। এই নিয়ে সরকারের তেমন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। এসব ক্রিয়াকলাপকে

www.pathagar.com

মাথা ঘামিয়ে সমাধান তথা জায়েজ করতে সরকারী অর্থেপুষ্ট বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক এবং প্রভাবশালী প্রচার মাধ্যম রয়েছে। তবে কখনো সখনো জনরোষ একটু চড়া হলে সরকারের কণ্ঠ থেকে 'হালুমলো খেলুমলো' জাতীয় হুমকী ধমকীর শব্দ শোনা যায়; যা কেবলই লোক দেখানো এবং প্রকৃত অবস্থাকে পর্দাচ্ছাদিত করাই যার উদ্দেশ্য। সরকারের এক প্রভাবশালী মন্ত্রীর অংশিদারিত্বের পত্রিকা দৈনিক ইত্তেফাক। এই ইত্তেফাকে গত ৭ জুন '৯৮ শিশু ধর্ষণ ও মাদকাসক্তের কারণ এবং শোষক শ্রেণীর পাচাটা জনৈক মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন এর আবিস্কৃত 'দাওয়াই' পরিবেশন করেছে বড় বড় হরফে। হেরোইন, ফেনসিডিল এবং গাইবান্ধা ষ্টাইলে হোমিও মিথাইল সেবনে যে গণমৃত্যু চালু হয়েছে তা থেকে মুক্তির উপায় নাকি নেশা করার আইনী ব্যবস্থা চালু করা। তিনি মাদকাসক্তের ফলে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে বলেছেন- 'কেরু এণ্ড কোম্পানীর সম্প্রসারণ এবং হিলট্রাক্টস ডিসটিলারীর উৎপাদনের অনুমতি ও নতুন নতুন ফরেন লিকার উৎপাদনের কারখানা প্রতিষ্ঠার অনুমতিদান, সরকারী ভাবে ফরেন লিকার ও ওয়াইন আমদানীর লাইসেন্স দান এবং ইপিজেড অঞ্চলে রপ্তানীমুখী মদ্যপ্রস্তুত বিষয়ে কলাবোরেশনের ব্যবস্থা দরকার।' লেখকের মন্তব্য - 'এতে চোরাচালানের মাধ্যমে বিদেশী মদ আমদানী কমে যাবে; সরকারেরও আয় বাড়বে।' নেশার সপক্ষে লেখকের যুক্তি- "নেশা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। আদিম যুগ হইতে নেশা একটি চিত্ত বিনোদনের উপায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। ক্ষেত্র বিশেষে নেশা উপাসনার আচার ও সংস্কৃতির অঙ্গ; ক্ষেত্র বিশেষে সামাজিক উৎসবেরও অঙ্গ।"

শিশু নারী ধর্ষণ খুন হত্যা প্রসঙ্গে একই রকম বক্তব্য মন্তব্য ব্যক্ত করতে বহুল পঠিত পত্রিকাটি এই আতেলকে সহযোগিতা করেছে। বিধি সম্মত যৌনাচার বন্ধের ফলে নাকি যত্রতত্র যৌন কর্মস্থল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নারী শিশু ধর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেছেন- "বাণিজ্যিক যৌন কর্মীদের পাড়া সমূহের উচ্ছেদের ফলে পুরুষগণ নির্দিষ্ট স্থান সমূহে পয়সার বিনিময়ে যৌন ক্ষুধা নিবারণ করতে না পেরে যেখানে পারছে এই অনাচার করছে। তারা নির্বিচারে শিশু নারী ধর্ষণ করছে।" এর সমাধান পত্রিকাটিতে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে- "আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনায় বৃটিশ আমলে প্রণীত এবং বর্তমান প্রচলিত আইন সম্মত উপায়ে নির্দিষ্ট এলাকায় বাণিজ্যিক যৌন কর্মীদের আবাসস্থল স্থাপনে প্রাইভেট সেক্টরকে উৎসাহিত করা প্রয়োজন।"

www.pathagar.com

না, এরপর বোধহয় প্রিয় পাঠকদের বোধগম্যের জন্য আমার আর নতুন কোন বিষয়ের উদাহরণ টানা নিষ্প্রয়োজন। "অতীতের উত্তরাধিকার সরূপ সরকার যে সকল সমস্যা পাইয়াছে সেগুলো কাটাইয়া ওঠার উপায় ও পন্থা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করণে সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীদের শক্তিশালী লেখনী ব্যবহারের জন্য এগিয়ে আসা উচিৎ" প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতেই যে এ জাতীয় উদ্ভট বিকৃত প্রস্তাব প্রোপাগাণ্ডা তাকি আর বলার অপেক্ষা রাখে? বলার অপেক্ষা রাখে না দেশের সকল সংকটের মূলে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্টপোষকতায় শোষক শাসক গোষ্ঠীর অর্থনৈতিক শোষণ। এই অর্থনেতিক শোষণ শাসনের বীজ লুকিয়ে রয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের নিয়ন্ত্রিত ঘুনেধরা আর্থ সামাজিক ব্যবস্থা ও শ্রেণী বৈষম্য মূলক বর্তমান রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতর। কিন্তু শোষক শাসক গোষ্ঠী প্রতিটি সমস্যা সংকটকে বিচ্ছিন্ন ভাবে তুলে এনে জনগণের সামনে হাজির করছেন প্রতারণামূলক সমাধানের পথ নির্দেশনা।

এই পথনির্দেশনাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য প্রয়োজন শ্রেণীচেতনা শানিত শ্রমিক কৃষক ও বঞ্চিত মানুষের সুসংগঠিত শক্তি। সেই শক্তিই পারে হ্যামিলনের বংশিবাদক ও আলেফ লায়লার শাহেরজাদীর জারিজুরির রহস্য ভেদ করে স্থবির নিশ্চল পাষাণপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যা এই বাংলাদেশকে জাগিয়ে তুলতে। তবে অচৈতন্য রাজকন্যার শিথানের কাঠি পৈথানে আর পৈথানের কাঠি শিথানে ওলোট পালট করার জন্য বিজ্ঞান সম্মত জ্ঞান, অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধি এবং আত্মোৎসর্গ করার মতো মানসিকতার আজ বড় বেশি প্রয়োজন।

www.pathagar.com

সমীপে আহমদ শরীফ

শ্রদ্ধাস্পদেসু
পাছে আপনি কী মনে করেন এই ভয় ভীতি দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে মুছে সীমিত জ্ঞান, অল্প বিদ্যা বুদ্ধি ও কিঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে সবিনয়ে আমার সামান্য কিছু বলার আছে। আমার বলার সূত্র মননশীল সাময়িকী পর্যাসের এপ্রিল-মে '৯৭ সংখ্যায় প্রকাশিত আপনার নিবন্ধ 'পাছে লোকে কিছু বলে।' পাছে লোকে কিছু বলে এর ভীতির কবলে পড়ে শক্তি সাহসের অভাবে 'কম্যুনিষ্টদের' অঙ্গীকার ভ্রষ্টতা এবং গা-পা বাঁচানোর অপচেষ্টা অবলোকন করে যে ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন, তা পড়ে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে এক গভীর বিষণ্নতা আপনার পিছু নিতে চলেছে। তাইতো আপনার মত এত বড় একজন তার্কিক, তাত্ত্বিক ও ক্ষুরধার লেখকের সংবেদনশীল কলমের কিছু অসাবধানী মন্তব্যের জবাব দিতে ভোতা কলমও প্রয়োজন হয়ে ওঠে। নিবন্ধে উপস্থাপিত সমস্যার গভীরের বিষয় যথার্থ ভাবে পর্যবেক্ষণের অভাবে কম্যুনিষ্ট সম্পর্কে অনাবশ্যক কথা এসে যাওয়ায় আমার স্বল্প বিদ্যা প্রসূত সামান্য কিছু বক্তব্য।

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের দালাল তথাকথিত রাজনীতিবিদদের অসততার কারণে কম্যুনিষ্ট শব্দটির ভর কিছুটা হলেও হেরফের ঘটেছে। বিশেষত: সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর কম্যুনিজমের সাইনবোর্ড সর্বস্ব নখদন্তহীন কিছু সংশোধনবাদী দলের আপোসমূলক কার্যকলাপ এর জন্য দায়ী। অথচ এই অল্প আগেও কম্যুনিষ্ট বা কম্যুনিজমের নামে থরথর করে কেঁপে উঠতো তামাম দুনিয়ার সকল শাসক শোসকের তখত্-তাউস্। সমাজ বিকাশের ইতিহাসে, বিপ্লবে বিদ্রোহে এখনও কিংবদন্তি হয়ে জ্বল জ্বল করছে হাজার হাজার কম্যুনিষ্ট বীর। সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের স্মৃতিতে শ্রদ্ধায় তারা ভাস্বর। আজও ল্যাটিন আমেরিকার পেরু সহ বিভিন্ন দেশ

www.pathagar.com

থাইল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, বার্মা, নেপাল, ভারত যেখানেই শ্রমিক কৃষক সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী জনযুদ্ধ; সেখানেই কম্যুনিজমের লাল ঝাণ্ডাবাহী কম্যুনিষ্টদের জন্য লক্ষ কোটি নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের লাল সেলাম। আমাদের দেশেও তার ব্যর্তয় ঘটেনি। সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে যারা গিয়েছেন; শ্রদ্ধার গর্বের অমৃত সন্তান হিসেবে তাঁরা ঠাঁই পেয়েছেন গণ মানুষের মনের মণিকোঠায়। আমার ব্যক্তিগত ছোট অভিজ্ঞতার কথা। ষাট দশকের শেষের দিকে জানি না কী ভাবে কোথা থেকে দু'একটা লিফলেট আমার হস্তগত হল। লিফলেটটি কোন এক বিপ্লবী সংগঠন কর্তৃক প্রচারিত। তাতে কোন এক বিশেষ এলাকার অসহায় ভূমিহীন গরীব কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের কথা। লিফলেটটি পড়ে সাংঘাতিক উৎসাহী হয়ে আরো জানার বুঝার আকাঙ্খায় বই কাগজ-পত্র সংগ্রহে নেমে গেলাম। যত পড়ি জানার স্পৃহা ততই বাড়ে। তখন প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবীদের কাজ কর্মের খবরও আসে মাঝে মধ্যে। কী সাংঘাতিক কথা! সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে দেশের কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষকে শোষণ মুক্ত করার জন্য মৃত্যুকে পরোয়া না করে যারা অমিত সাহসের সাথে গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে, পাহাড়ে-পর্বতে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে মাথা নত হয়ে আসতো। খুউব ইচ্ছে হয়েছিল বীর কম্যুনিষ্ট দেখার। কম্যুনিষ্ট খুঁজে বেড়াতাম। খুঁজে বেড়াতাম শ্রদ্ধা নিবেদনের উদ্দেশ্যে, সেলাম জানাতে। না, বহুদিন খুঁজেও দেখা পাইনি কোন কম্যুনিষ্টের। অবশ্য যে ভদ্রলোকের মাধ্যমে বইপত্র কিনতাম এবং দেশ সমাজ আন্দোলন সংগ্রাম সম্পর্কে কথাবার্তা হতো, পরবর্তীতে আবিস্কার করলাম উনি নিজেই একজন কম্যুনিষ্ট। আজীবন জনগণের জন্য লড়াই করেছেন। পরে জেনেছি দেশ ও জনগণের জন্য যারা সত্যিকার ভাবে নিবেদিত; আত্মপ্রচার আত্ম অহংকার তাদের থাকতে নেই। নিজ স্বার্থকে বিপ্লব, জনগণের স্বার্থের অধীন করার ইচ্ছের কাছে বাকী সব তুচ্ছ। ভেবে অবাক হই কী মানসিক দৃঢ়তা, কী বীরোচিত মনোবল! আত্মপরিচয়ের এবং আত্ম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সচরাচর দেখা যেতো না তখন। আর বর্তমানে? যে দিকে তাকাই কম্যুনিষ্ট; স্বঘোষিত কম্যুনিষ্ট! ডাইনে-বামে, সামনে-পিছনে, ওপরে-নীচে কোথায় নেই কম্যুনিষ্ট? কম্যুনিষ্ট হরেক প্রকার। রূপ রঙ ধরণ ধারন একেক কম্যুনিষ্টের এক এক রকম। চীনা-সোভিয়েত, বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী এমন কি বাংলাদেশী কম্যুনিষ্টও দেখা যায়। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী ফ্যাশানিষ্ট কম্যুনিষ্টরাতো আছেনই। আরো আছেন মুসলিম কম্যুনিষ্ট, হিন্দু কম্যুনিষ্ট। ওয়ারীর 'সুপার হোটেল-কম্যুনিষ্ট' আর পল্টনের 'ফ্রেশপটস-কম্যুনিষ্ট'দের কথা কে না জানে? তবে হ্যাঁ, আর এক অভিনব কম্যুনিষ্টের কথা

www.pathagar.com

আমি জানি, সম্ভবত: অনেকেই জানেন না। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া জানা উচুঁ পদের এক সবজান্তা ভদ্রলোক। দীর্ঘ দিনের পরিচয়। কারো কিছু শোনা নয়; বলতে পারাটাই তাঁর আনন্দের, গর্বের। হাওয়ার অনুকূলে পাল খাটাতে খুবই পারদর্শি।

ভদ্রলোকের ধারণা যেহেতু উনি তাঁর ঘরের সদস্যদের মধ্যে ইলিশ মাছের পেটি লেজা মাথা ভাগ বাটোয়ারায় সাম্যতা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন, তাই তিনি একজন কম্যুনিষ্ট হয়ে গেছেন। আমি তাঁর ইলিশ মাছ ভাগ বাটোয়ারার বৃত্তান্ত শুনে নাম দিয়েছি ইলিশ বাট কম্যুনিষ্ট। এই ইলিশ বাট কম্যুনিষ্টের সংক্ষীপ্ত বৃত্তান্ত- ভদ্রলোক হঠাৎ একদিন বীরদর্পে হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে বললেন "আপনি আচড়ি ধর্ম, অপরকে শেখাও।" কি প্রসঙ্গে এ উপদেশ বাক্য না বুঝে চুপই রইলাম। আমি চুপ থাকলে হবে কি! উনিতো আর চুপ থাকার লোক নন! তাঁর অসম্ভব অসাধারণ কিছু একটা করার কথা শোনাবার জন্য অস্থির হয়ে ওঠলেন, বললেন- 'আরে তোমাদের লোকেরা কুম্যনিজম কি প্রতিষ্ঠা করবে? যদি পারো আগে নিজের ঘরে কুম্যনিজম প্রতিষ্ঠা করে দেখাও, সমাজ টমাজতো অনেক দূর! কম্যুনিজম সম্পর্কে আমার কাছ থেকে তোমাদের শিক্ষা নেয়া উচিৎ।" সে মূহুর্তে তাকে অসম্ভব অসহ্য লাগলেও মুখে বললাম- 'তাই নাকি?' আমার সামান্য কথায় যেন তাঁর উৎসাহ বেড়ে গেল। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর ভাবে ভদ্রলোক তার কম্যুনিষ্ট হওয়ার শানে-নজুল পেশ করলেন- "আজ বাজার থেকে ছ'ছটি ইলিশ মাছ এনেছি। জানোতো বাসায় আমরা ছ'জন।" আমি হিসাব করে ফেললাম বউ বাচ্চাসহ বাসায় তারা ছ'জনই, দু'জন কাজের মেয়েকে হিসাবে রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি? বুঝে গেলাম। তাঁর পরিসংখ্যানের ভুল না শুধরিয়ে বললাম- 'নিশ্চয়ই ছ'জন ছ'টি আস্ত ইলিশ খেলেন? এটাকেই কি কম্যুনিজম বলছেন?" "আরে না না, তুমি ধারণাই করতে পারোনি আমার ইলিশ মাছের ভাগ বাটোয়ারার সাম্যতা বিধানের সুক্ষ্ম বিষয়?" ভদ্রলোক মুখে খই ফোটাতে লাগলেন- 'বাসায় নির্দেশ দিয়েছি যখন পেটি রান্না হবে সব্বাই যেন পেটি খেতে পারে। আবার গাদা মাথা লেজা অর্থাৎ মাছের একই অংশের খাওয়ার স্বাদ সবাই যেন সমান ভাবে পায় তার নিশ্চয়তা বিধান স্বরূপ ছ'জনের জন্য ছ'টি মাছ কেটে রান্না হবে। বাজার থেকে একটি মাছ আনা হলে কেউ পীঠের অংশ, কেউ মাথা, কেউ লেজা আবার কেউ পেটি খায়! কী বিচ্ছিরি অবস্থা বলোতো! অতএব ছটি মাছ; যা খাওয়া হবে ছ'জনের পাতে একই জিনিষ। কেউ লেজা খেতে খেতে মাথার দিকে তাকাবে, কেউ পীঠের মাছ খেতে খেতে পেটির দিকে চাইবে তা যেন না হয়। সবাই সমান।'

ভদ্রলোকের এ হেন কম্যুনিজমের থিউরি শুনে রাগে দুঃখে ঘৃণায় জবান আমার বন্ধ। জানিনা তবু কি কারণে বলে ওঠলাম- 'বাহ বাহ চমৎকার। সত্যি আপনি একজন গ্রেট

www.pathagar.com

কম্যুনিষ্ট।" এ বিষয়ে ভদ্রলোকের সাথে আর কোন দিন কথা হয়নি। এই বিলাসী কম্যুনিষ্ট তার বিলাসীতা কতদিন ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছেন তা জানি না। অবশ্য জানার আগ্রহও আমার নেই। শুধু রকম ধরন কম্যুনিষ্টদের রূপ রঙ বর্ণনায় প্রাসঙ্গিক ক্রমে এই ইলিশ বাট কম্যুনিষ্টদের কথা এসে গেল। মূলতঃ আমার বলার বিষয় এসব প্রতিক্রিয়াশীলদের ক্রিয়া কলাপকে কম্যুনিষ্ট ক্রিয়াকলাপ হিসাবে সমালোচনা করা কতটা যুক্তিযুক্ত? বিপ্লবের বিজ্ঞানের দর্শন দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদকে বাদ দিয়ে ইলিশ বাট কম্যুনিষ্টদের যদি সমাজ বিপ্লবের তাত্ত্বিক আলোচনায় উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করি তাতে আষাঢ়ে গল্প ছাড়া কাজের কাজ কিছু হবে কি?

শ্রদ্ধেয় স্যার, সাম্রাজ্যবাদের বিশ্বস্ত অনুচর সংশোধনবাদী এবং ধাপ্পাবাজ সাম্যবাদীদেরকে কম্যুনিষ্ট মনে করে কম্যুনিষ্টদের সম্পর্কে আপনার ঢালাও মন্তব্য- "আমাদের কমুনিষ্টরাও উগ্র ধর্মধ্বজী মুসলিম রোষমুক্তির এবং ভোটরূপ দয়া প্রাপ্তির গরজে নতুন করে 'ধর্ম কর্ম সমাজতন্ত্র' নামের এক জিগির বা শ্লোগান তৈরী করল, শ্লোগান বা 'নারা' হচ্ছে সোনার পাথর বাটির মতোই অদ্ভুত ও অসম্ভব। তাদের এ নীতি সাপও মরে আর লাঠিও না ভাঙ্গে নীতিরই নামান্তর মাত্র। শক্তি সাহসের অভাবে এ হচ্ছে কম্যুনিষ্টদের অঙ্গীকার ভ্রষ্টতা। গা পা বাঁচানোর অপচেষ্টা মাত্র।" দ্বন্দ্ব মূলক বস্তুবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বহারা শ্রেণীর একাধিপত্যের তথা মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের আদর্শ চ্যুৎ হয়ে সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত নির্বাচনে অংশ গ্রহণ, তথাকথিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক নির্বাচনের মাধ্যমে সর্বহারা শ্রেণীর ক্ষমতা দখল এবং'ধর্মকর্ম সমাজতন্ত্রের' নামে যারা জিগির তোলেন; তারা কবে কোথায় কোন সংজ্ঞায় কম্যুনিষ্ট ছিলেন বা আছেন তা আমাদের জানা নেই। তাদেরকে কম্যুনিষ্ট হিসেবে আখ্যায়িত করার অর্থ দেশের দরিদ্র কৃষক, অভূক্ত শ্রমিক, অসাম্যপীড়িত মানুষ তথা সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী জনযুদ্ধের লড়াইয়ের প্রস্তুতিকে বিভ্রান্ত করা। জানি না ইলিশ বাট কম্যুনিষ্টদের মত বাংলাদেশের বাম জোটভূক্ত কিংবা অন্য কিছু বাম নামধারী স্বঘোষিত কম্যুনিষ্টদেরকে আপনার চিন্তায় হাজির নাজির রেখে নিবন্ধটি তৈরী করেছিলেন কিনা? যেহেতু সত্য উচ্চারণে আপনার সাহসী কলম দ্বিধা-দ্বন্ধহীন, তাই উল্লেখিত কম্যুনিষ্টদের সংগঠনের নাম সুস্পষ্ট ভাবে বলার প্রয়োজন ছিল। তাতে দেশের বিপ্লবকামী মানুষ বিভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতেন। দেশের নব্বই ভাগ শোষীত নিপীড়িত মানুষকে মুক্তির লক্ষ্যে সচেতন করার জন্য এই তথাকথিত কম্যুনিষ্টদের মুখোশ উন্মোচন এখন জরুরী কাজ। এ প্রসঙ্গে কম: অজয় দত্তের 'কারা বামপন্থী কারা বিপ্লবী' থেকে সামান্য উদ্ধৃত করছি:

www.pathagar.com

"আজকাল বামপন্থী ও বিপ্লবী শব্দের অহরহ প্রয়োগ হচ্ছে। উভয় শব্দের উদ্ভবের একটি ইতিহাস আছে। উদ্ভবের পর থেকে বিপ্লব শব্দের অর্থের কোন পরিবর্তন না হলেও এই শব্দের উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রয়োগ হচ্ছে। বামপন্থী শব্দের অর্থ সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। সময়ের ও যুগের উপযোগী বামপন্থী শব্দের যে অর্থ দাঁড়ায় তারও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রয়োগ হচ্ছে। উভয় শব্দের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রয়োগ জন্ম দিচ্ছে প্রচণ্ড বিভ্রান্তির। এই দুই শব্দের প্রতি নিপীড়িত নির্যাতিত এবং শোষণ নিপীড়নের অবসানকামী সকল জনগণের আকর্ষণের কারণেই বিপ্লব ও বামপন্থার বিরোধীরা এই শব্দ যুগলের অপপ্রয়োগ করে তথা বামপন্থী ও বিপ্লবের টুপী পরে নিজেদের কুৎসিৎ চেহারাকে আড়াল করতে চাইছে। তাই ভূঁয়ো বামপন্থী ও বিপ্লবীদের মুখোশ খুলে ধরার জন্য প্রকৃত বিপ্লবী ও বামপন্থীদের বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে।" বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে 'বামপন্থী' মুখোশের অন্তরালে দক্ষিণপন্থী শিয়াল পণ্ডিতদের কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে কমঃ অজয় দত্ত লিখেছেন- "যারা কার্যত প্রচলিত গণবিরোধী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার চৌহদ্দিকে বজায় রেখে তারই আওতায় কিছু কিছু সংস্কারের পক্ষে প্রচার ও আন্দোলন করে এবং প্রচলিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার রক্ষক কোন না কোন পক্ষের পেছনে পেছনে চলে তথা লেজুড় বৃত্তি করে, মুখে 'বামপন্থী' বুলি ধারণ করলেও তারা আদতে দক্ষিণপন্থী। জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বর্ণচোরা এই 'বামপন্থী'দের মুখোশ খুলে ধরা সমাজ ও রাষ্ট্র বিপ্লব তথা বিপ্লবী শক্তির বিকাশের জন্য অপরিহার্য। বিপ্লবী ও বামপন্থীদের মধ্যে পার্থক্য হল সকল বিপ্লবীরাই বামপন্থী। কিন্তু সকল বামপন্থীরা বিপ্লবী নয় অর্থাৎ যেসব বামপন্থীরা জীবন বাজি রেখে রাষ্ট্র ও সমাজ বিপ্লবের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং দৃঢ়তার সাথে ও অব্যাহতভাবে তা চালিয়ে নেয় তাঁরাই বিপ্লবী। ওপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্যের আলোকে এখন দেখা যাক আমাদের দেশে 'বামফ্রন্ট' নামের অন্তর্ভূক্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলোকে বামপন্থী বলা যায় কিনা। বর্তমান বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কি তার বৈপ্লবিক রূপন্তরের আশু বাস্তবতা তুলে ধরে? নিশ্চয়ই। কোন প্রগতিকামী ব্যক্তি বা সংগঠনই এই বাস্তবতা অস্বীকার করতে পারেন না। কারণ বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিই এটাকে মূর্ত করে তুলেছে। বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক কর্মচারীসহ বিভিন্ন শ্রমজীবী দেশপ্রেমিক মধ্যবিত্তসহ শতকরা ৯০ ভাগ জনতা বর্তমান পরিস্থিতি থেকে মুক্তি কামনা করে। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং তাদেরই পদলেহী লুটেরা বুর্জোয়া সামন্ত শ্রেণীর দ্বারা শোষিত শাসিত আধা-উপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা। ১৯৭১ সনের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের উদ্ভব হলেও সাম্রাজ্যবাদ

www.pathagar.com

ও সামন্তবাদের উৎখাত হয়নি। পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর কবল থেকে মুক্ত হয়ে পড়েছে ভারতীয় সম্প্রসারণবাদী শাসকগোষ্ঠীর কবলে। ফলে বাংলাদেশ বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ সম্প্রসারণবাদ সামন্তবাদ এবং তাদেরই সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা লুটেরা আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়া বিরোধী নয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে রয়েছে। এই বিপ্লবের ক্ষেত্রে ওপরোক্ত শত্রু শ্রেণীগুলো ও তাদের রক্ষাকারী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে এবং রাজনৈতিক হাতিয়ার তথাকথিত জাতীয় সংসদকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন ও সহযোগিতাকারী কোন শক্তিই বামপন্থী বা গণতান্ত্রিক শক্তি নয়। তথাকথিত বামফ্রন্টের বড় সংগঠন তিনটি। ওয়ার্কার্স পার্টি, সিপিবি ও বাসদ। অন্যান্য সংগঠনগুলো ক্ষুদে ব্যক্তি কেন্দ্রিক গ্রুপ, ফ্রন্ট ভিত্তিক তৎপরতার মাধ্যমেই তাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল।"

কমরেড অজয় দত্ত তার প্রবন্ধে এসব ভূয়া বাম সংগঠনগুলোর ঘোষণা, কর্মসূচী, মতাদর্শ ও রাজনীতিকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের আলোকে বিচার বিশ্লেষণ করে আরো বলেছেন- "এদের বক্তব্য চরম স্ববিরোধী এবং কম্যুনিজম ও বিপ্লবের দিক থেকে চরম অমার্কসীয়।" কমিউনিষ্ট নামধারী সিপিবি সম্পর্কে তিনি এক জায়গায় বলেছেন- "সামন্তবাদী সংস্কৃতি ধর্মের প্রশ্নে ওয়ার্কার্স পার্টি ও সিপিবি এর অবস্থান একই। পূর্বে সিপিবি এর সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিকের নির্বাচনী প্রচার পত্রের প্রথমেই 'আল্লাহু আকবর' ও 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ এবং ১৯৯০ সনে পদযাত্রা শেষে তাদের তথাকথিত মহাসমাবেশ শেষে সাধারণ সম্পাদকের ঘোষণা- 'মসজিদের ইমাম মুসল্লিরা আমাদের দোয়া করেছেন, প্রভৃতি একদিকে প্রমাণ করে তারা জামায়েত-ই-ইসলামীর মত রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করেন। অন্যদিকে তারা সর্বহারা বিপ্লবী ও গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিপরীতে সামন্তবাদী সংস্কৃতির প্রচারক, তথা অবক্ষয়ী সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক। কাজেই তাদের 'কমিউনিষ্ট' শব্দের ব্যবহার একেবারে অসঙ্গত এবং চরম ধাপ্পাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। অবক্ষয়ী বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থার রক্ষাকারীদের সহযোগী বলে তারা বামপন্থী শক্তিও নয়।" অতএব এই চরিত্রহীন ভ্রষ্ট বাম বা মেকী সাম্যবাদীদেরকে কম্যুনিষ্ট হিসেবে বিবেচনায় রেখে তাদের নিয়ে দেশের মানুষকে 'সমকালীন প্রগতিশীল প্রাগ্রসর চিন্তায় চেতনায় বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিক স্তরে উন্নীত করার আশা মরীচিকার মৃত্যু ফাঁদে আত্ম বিসর্জন বৈ কিছু নয়।

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু, আপনার সত্যানুসন্ধানী কলমের তত্ত্ব ও তথ্যবহুল বিশ্লেষণধর্মী লেখায় আমরা সর্বদাই আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে জীবন জয়ের সংগ্রামী পথের দিক নির্দেশনা

www.pathagar.com

পেয়ে থাকি। আপনার যুক্তিবাদী মানবতাবাদী দর্শনের সাহসীকতাপূর্ণ রচনা আমাদেরকে বিজ্ঞান মনস্কতায় উদ্বুদ্ধ করে আসছে। আপনার শিক্ষার আলোর পথই আমাদের পথ। না, আমরা ঐ মরীচিকার পিছু ছুটতে চাই না। আমরা আপনার মত আধুনিক-মনস্ক মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন বস্তুবাদী মানুষ হতে চাই। 'পাছে লোকে কিছু বলে' নিবন্ধের শুরুতে আপনার বস্তুবাদী বিশ্লেষণ- "মার্কসবাদ অঙ্গীকার করলে কেউ আস্তিক বা শাস্ত্রিক বিশ্বাসে ও সত্যে আস্থা রাখতে পারে না। কেননা দুনিয়ার তাবৎ শাস্ত্রেই মৌরদী সম্পদ ভোগের অধিকার ন্যায্য বলে স্বীকৃত। কাজেই মার্কসবাদী মাত্রই বাহ্যত অন্তত নিরীশ্বর নাস্তিক এবং শাস্ত্রে আস্থাহীন।" এ বক্তব্যের সাথে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ বিশ্বাসী মাত্রই একমত। এর সাথে দ্বিমতের কোন প্রশ্নই আসে না। আমার প্রশ্ন বিপ্লবের বিজ্ঞান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ- মাওবাদকে বর্জন করে বা ভূল ব্যাখ্যা দিয়ে যারা "স্বল্প বুদ্ধির দুর্বল অদূরদর্শী নেতৃত্বে ভোট জোগাড়ের সহজপন্থা হিসেবে জনমতের উমেদার" যারা "ধর্মধ্বজী হয়েই রাজনীতি করে" তাদেরকে কি কম্যুনিষ্ট বা মার্কসবাদী বলা সঠিক? হতে পারে তারা নিজেদেরকে মার্কসবাদী বলে পরিচয় দিতে ভালবাসেন। গলা ফাটিয়ে সাম্য মৈত্রীর কথা বলেন।

শ্রদ্ধেয় স্যার, পরিশেষে বলতে চাই এই ইলিশ বাট কম্যুনিষ্ট বা মেকী সাম্যবাদীদের আমরা না চিনলে কি হবে, লোকশিল্পের সন্ধানী, রসিক-কবি গুরুসদয় দত্ত কিন্তু এই বাক্য বাগিশদের সাম্য মৈত্রীর মর্মবাণী ঠিকই বুঝেছিলেন। তাইতো সে সাম্য মৈত্রীর নিগূঢ় রহস্যকে তিনি উন্মোচন করে গেছেন তার কবিতায়-

"চলবো মোরা দুজন হ'য়ে
চিরদিনের সাথী
আমি হবো মাহুত তোমার
তুমি আমার হাতী।
মোরা থাকবো হয়ে জোড়া
আমি হবো সোয়ার তোমার
তুমি আমার ঘোড়া।
মোরা চলবো দুজন ছুটে
আমি হবো মোটটি তোমার
তুমি আমার মুটে।"

www.pathagar.com

সংবাদপত্রের চালচিত্র

'প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্পের সংকট এবং সম্ভাবনা' শীর্ষক পঠিত প্রবন্ধের আলোচনায় বিশিষ্ট কবি শামসুর রাহমান অংশ গ্রহণ করে অত্যন্ত ক্ষোভ ও ভারাক্রান্ত স্বরে দ্বিমত পোষণ করে ছিলেন প্রবন্ধের একটি বক্তব্যের সাথে। সে বক্তব্য সম্বলিত প্যারাটি ছিল- "সাংবাদিকতা একটি মহৎ শিল্প কর্ম। সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার কথা স্বার্থকভাবে তুলে ধরে রাজনৈতিক চেতনা উদ্দীপনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত। সংবাদপত্রে মত প্রকাশে সরকার এবং মালিক পক্ষ থেকে দু'ভাবেই বাঁধার সম্মুখীন হচ্ছেন সাংবাদিকগণ। এছাড়া বেশকিছু সাংবাদিকের রক্ষণশীলতার কারণে নতুন যুগ চেতনার সংবাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন দেশের মানুষ।" মূল প্রবন্ধটিকে শ্রদ্ধেয় কবি শামসুর রাহমান সময় উপযোগী সাহসী লেখা বলে প্রশংসা করলেও তাঁর আপত্তি- 'সাংবাদিকতা একটি মহৎ শিল্পকর্ম' বাক্যটিতে। অবশ্য এ প্রসঙ্গে কবি তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ যুক্তিযুক্ত মতামতও ব্যক্ত করেছিলেন চমৎকার সুললিত ভাষায়। বেশ ক'বছর আগে কথা, মনে নেই সব কিছু। তবে বাহারী সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কলামে কলামে সাংবাদিক বন্ধুরা তাদের ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট মহৎ কর্মের যে নমুনা রাখছেন তা দেখে নিজেকে সভ্য সমাজের মানুষ ভাবতেও লজ্জা হয়। মুর্খতারও একটা সীমা থাকে। সত্যই কি আমরা এতটা নির্বোধ পাবলিক? সাংবাদিকদের ধারণাটা কি?

সংবাদপত্র পড়ে মাঝে মধ্যে বড় দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগি। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারি না। সংবাদপত্র নাকি সমাজের দর্পণ! আমিওতো এ সমাজের একজন। সে দর্পণে একি আমার রূপ! দেখে আৎকে উঠি! আৎকে উঠি স্যেকুলারিজমের প্রবক্তা প্রধানমন্ত্রীর ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিষয় আশয় সংবাদপত্রে অবলোকন করে। মৌলবাদীদেরকে মুখে যতই গালাগাল দিক না কেন পোশাকে আশাকে বিশ্বাসে এককথায় 'অন্তরে বাহিরে' এই

www.pathagar.com

ধর্মনিরপেক্ষ প্রধানমন্ত্রী মৌলবাদীদের সবটুকুই দখল করে নিয়েছেন। গত ৫ই এপ্রিল দৈনিক বাংলায় বক্সবেষ্টিত সুশোভিত একটি সংবাদ পড়ে এই আশংকা না হওয়ার কোন কারণ নেই যে, শেখ হাসিনা শীঘ্রই বুজর্গ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছেন। সত্য সত্য না হলেও অন্ততঃ সংবাদপত্র ও তার সাংবাদিকদের মাধ্যমে আলেমদার প্রধানমন্ত্রীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সংবাদের অংশ বিশেষ- "বৃহস্পতিবার এশার নামাজের পর মোনাজাতে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ দলের জন্য প্রার্থনা করেন। সকালে ফজরের নামাজ থেকে বাংলাদেশ দলের ফলাফল ঘোষণা পর্যন্ত প্রধানন্ত্রীর হাতে ছিল তসবিহ। সারাক্ষণ তিনি প্রার্থনা করতে থাকেন আল্লাহপাকের দরবারে। ক্ষণে ক্ষণে প্রধানমন্ত্রী খেলার ধারাভাষ্য শুনেছেন। এই সময় তাকে কিছুটা উদ্বিগ্ন আবার কখনও আনন্দিত মনে হয়েছে। একটি বারের জন্যও তার হাত থেকে তসবিহ সরেনি। এমনকি খাবার টেবিলেও তাঁর হাতে তসবিহ ছিল। সারাক্ষণই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন প্রার্থনারত। তিনি ফলাফলের অপেক্ষায় থাকেন। জানা গেছে, খেলার চূড়ান্ত ফলাফল শোনার পর প্রধানমন্ত্রী শুকুরিয়া নামাজ আদায় করেন-----।"

উন্নত কম্পিউটার প্রযুক্তি ইন্টারনেটের যুগে একটি দেশের প্রধানমন্ত্রীর এ জাতীয় বিকৃত কার্যকলাপকে আমরা কোন দৃষ্টিতে দেখবো? এটা কি মৌলবাদীদের সাথে তাঁর ষ্টান্টবাজি, নাকি শিক্ষার আলো বঞ্চিত দেশের সাধারণ মানুষের সাথে প্রধানমন্ত্রীর ধোঁকাবাজি? আর ঘটনা সত্যি হলে অবশ্যই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর জ্ঞান ও শিক্ষার দৌড়ে দেশের অজ্ঞ কাঠমোল্লাদের সাথে তুলনা করা চলে। কর্তব্যনিষ্ঠ কর্ম বিবেচনায় যে সাংবাদিক বন্ধুরা প্রধানমন্ত্রীর এই মুর্খামী জনসম্মুখে উপস্থাপনা করেছেন তাদের কথা আর কি বলবো? এহেন প্রধানমন্ত্রীর দেশের সাংবাদিকদের কলম থেকে এর বেশি কিইবা আশা করা যায়? শোষণ ভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সাংবাদিকরা চিরকালই মেরুদণ্ডহীন। শুধু সাংবাদিক কেন, রেডিও টেলিভিশনসহ সকল প্রচার মাধ্যম শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শাসকরা তাদের দখলকৃত শোষণমূলক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা নিজেদের স্বার্থে টিকিয়ে রাখতে প্রচার মাধ্যমগুলোকে অস্ত্র হিসাবে শোষিত জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। সাধারণ মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হয় শোষক শ্রেণীর পরিবেশিত বিচিত্র ধরনের সংবাদ ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের মনলোভা প্রচার প্রপাগাণ্ডায়। এই প্রতারণার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র সমূহের নির্লজ্জ ভূমিকা অত্যন্ত দুঃখজনক। সংবাদপত্রগুলো সরকার ও ব্যক্তি মালিকানাধীন হলেও এর অর্থ যোগানদার পাঠক, সাধারণ মানুষ। পরোক্ষভাবে সাধারণ মানুষের টাকায়ই এসব সংবাদপত্রের ব্যবসা পরিচালনা করে

www.pathagar.com

মালিকরা একদিকে যেমন বিপুল অর্থ বৈভবের অধিকারী হচ্ছেন, অন্যদিকে তারা কূটবুদ্ধিচালে ভাষার চাতুরীতে উপস্থাপনার চমৎকারীত্বে এসব সংবাদপত্রে পচামাল সরবরাহ করে সাধারণ মানুষর সর্বনাশের বারোটা বাজাচ্ছেন। সাধারণ মানুষ যাতে তাদের ওপর লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে না পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ধনীক শ্রেণীর মুখপত্রগুলো প্রতি নিয়ত ছড়িয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন বিভ্রান্তির জাল। কি রাজনৈতিক প্রশ্নে, কি অর্থনৈতিক প্রশ্নে, এমনকি সাংস্কৃতিক ধর্মীয় বিষয়ে সংবাদপত্রগুলোর শোষণমূলক প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকা দেশ ও জাতির জন্য সৃষ্টি করেছে এক নিদারুণ ভায়াবহ পরিস্থিতি। অশিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিতই শুধু নয়, শিক্ষিত সমাজও প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সংবাদ পত্রে পরিবেশিত তথ্য ও তত্ত্বকে বেদবাক্য হিসেবে মেনে নিচ্ছেন। ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তায়, জীবন-যাত্রায় সংবাদ পত্রের কালগ্রাসী প্রভাব সুস্পষ্ট।

সাধারণ চোখে নয়, তৃতীয় নয়নে একটু লক্ষ্য করলে দেশের প্রচলিত সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় কি থাকছে এবং তা কি উদ্দেশ্যে ছাপা হচ্ছে তা বুঝে নেয়া খুব কঠিন কিছু নয়। স্বল্প পরিসরে সকল পত্রিকার নমুনা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয় বিধায় আলোচনার সুবিধার্থে প্রাচীন এবং বহুল প্রচারিত বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ৮/৫/৯৭ ইং তারিখের 'দৈনিক ইত্তেফাক' সংক্ষীপ্ত আকারে তুলে ধরা হচ্ছে। পত্রিকাটির দৈর্ঘ্য ২১ ইঞ্চি। প্রতি পৃষ্ঠার কলাম সংখ্যা ৮। মোট ১৬ পৃষ্ঠার পত্রিকা। এবার দেখা যাক পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় কিসের বয়ান।

পত্রিকাটির ১৫ পৃষ্ঠায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের একটি, অষ্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী ও খেলার খবর মোট জায়গা ৩ কলাম ১৫ ইঞ্চি, বাদবাকী ১ম পাতার অবশিষ্ট খবর। ১৪ পৃষ্ঠায় ৩ ক: ১৮ই: শেয়ার বাজার বাকীটা খেলার সংবাদ। ১৩ পৃষ্ঠায় ছিটেফোটা দু' একটি ফসলের সংবাদ, একটি সংসদ সদস্যের সংবাদ বাকী সব বিজ্ঞাপন। ১২ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন। ১১ পৃষ্ঠা সবটাই বিজ্ঞাপন সাথে নিখোঁজ সংবাদ ১ ক: ১২ ই:, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও তাহের পরিষদ এর খবর ১ ক: ৮ $\frac{১}{২}$ ই: এবং বাংলাদেশের প্রশংসা অষ্ট্রেলিয়ার উপপ্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১ ক: ৮ ই:। পুরো পৃষ্ঠা ব্যাপি বিজ্ঞাপন ১০ নং পাতা। ৯ পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন ও ৩ পাতার অবিশিষ্ট। ৩ পৃষ্ঠার আরো অবশিষ্ট এবং বিজ্ঞাপন ৮ পৃষ্ঠায়। ডাক্তারদের রোগী সংগ্রহের কৌশল নাম ঠিকানা যুক্ত স্বাস্থ্য বিষয়ক পাতা ৭। এতে ধনী লোকদের কিছু রোগ এবং সুন্দর আকর্ষণীয় ফিগার সম্পর্কীত ফিচার রয়েছে। ৬ এর পাতা বিজ্ঞাপন পুরো।

www.pathagar.com

৫ পৃষ্ঠায় ৫ ক: ১১ ই: ৩য় পৃষ্ঠার অবশিষ্ট খবর সাথে দীর্ঘ বিজ্ঞাপন। ৪নং পাতায় রয়েছে ৬ ক: ১২ ই: তে কয়েকটি মামুলী চিঠি পত্র, ৬ ক: ৮ই: জুড়ে উপ-সম্পাদকীয়। যার বিষয়বস্তু ভারতের দিল্লীতে অনুষ্ঠিত নির্জোট সম্মেলন। এই উপসম্পাদকীয়তে বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের মহান নেতা কমরেড ষ্ট্যালিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতিকে আগ্রাসী বলে সমালোচনা করা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপের কমিউনিষ্ট দেশগুলোর সমবায়ে গড়ে ওঠা ওয়ারশ জোটের সমালোচনার মাধ্যমে ন্যাটো জোটের সাফাই গাওয়া প্রকারন্তরে সাম্রাজ্যবাদের দালালীর নামান্তর। এই পাতায় আরো আছে দু'দুটি সম্পাদকীয়, যথাক্রমে ২ ক: ১০$\frac{১}{২}$ ই: এবং ২ ক: ১০ই:। একটিতে এফ ডি আর সেমিনারে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে সাধুবাদ জানিয়ে 'দেশে সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগের বাধা দূর করার লক্ষ্যে নয়ানীতি প্রণয়নের জন্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছেন' তার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়েছে। দেশের নিরুপায় সাধারণ মানুষের শ্রম শক্তিকে সস্তা উল্লেখ করে বিদেশী পুঁজি ও বিনিয়োগকারীদের শ্রম শোষণে আহ্বান জানানো সম্পাদকীয়টির উদ্দেশ্য। অন্য সম্পাদকীয়তে এ এফজি'র বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বলা হয়েছে বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন বিনিয়োগকারীদের জীবনের নিরাপত্তার, সামাজিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, হরতাল সংঘর্ষহীন দেশ। ঐ বিদেশী দেশী বেনিয়াদের দ্বারা প্রতিনিয়ত শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষের নাকি উচিৎ দস্যুদের সাথে উষ্ণ বন্ধুত্ব মূলক আচরণ? ৩নং পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন যথাক্রমে ৮ ক: ৯ ই:, ৪ ক: ১০ ই: ও ২ ক: ৩ ই:। এছাড়া যৎকিঞ্চিত চাষাবাদ, অপরাধ সংক্রান্ত এবং দুর্ঘটনার খবর। একটি রেল ষ্টেশন ঘরের ছবি ২ ক: ৩ ই:। ছবির নিচে ক্যাপশন 'হবিগঞ্জে ধুলিয়া খাল রেল স্ট্যাশনের মূল ভবনে দু:স্থ পরিবার।' লেখার ধরন এমন যে দুঃস্থ পরিবার যেন রেল স্টেশনের মূল ভবনটিতে অনধিকার ভাবে রয়েছে। ২ নং পাতার ৩ ক: ১০ ই: জুড়ে বিটিভি, জিটিবি, ডিডি-৭, স্টার প্লাস ইত্যাদি টেলিভিশন চ্যানেলের আগ্রাসী নগ্ন সংস্কৃতির অনুষ্ঠান সূচি। বাকী অংশ ১ম পাতার অবশিষ্টাংশ। সংবাদপত্রের ১ম ও শেষ পাতাকে সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ পাতা বলে ভাবা হয়। এই ১ম ও শেষ পৃষ্ঠায় পরিবেশিত বিভিন্ন সংবাদকেও তাই গুরুত্বপূর্ণ বলেই ধরা যায়। ৮ই এপ্রিলের (৯৭ই) ইত্তেফাক সংবাদপত্রটির ১ম ও শেষ পাতার Content analysis (আধেয় বিশ্লেষণ) করে দেখা যাক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ কি কি? প্রথম ও শেষ পাতার Printed Area (২১´´ ×৮×২) ৩৩৬.০০। এতে রয়েছে রাজনৈতিক খবর, সরকারী তথা আওয়ামী লীগ দলীয় ২০.৫৯%, বিএনপি দলীয় ৭.৩৫%, জাতীয় পার্টি ও জামায়েত-ই-ইসলামী ২.২%, শেয়ার কেলেংকারীর সাথে জড়িত শেয়ার

www.pathagar.com

দুর্বৃত্তদের মুক্তি পাওয়ার সংবাদ ২.২৩%, খেলাধুলা ৭.৪৭%, দেশের গরীব কিশোরদের নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দেশের রাষ্ট্রদূতের অবসর বিনোদন কৌতুক ৪.৪৬%, আমলা সংক্রান্ত ২.২৯%, ষ্ট্যাণ্ডিং ৫.২০%, অপরাধ সংক্রান্ত ১০%, বিবিধ ৩.২৭% এবং বিজ্ঞাপন ৩৪.৯৪%। এইতো বাংলাদেশের সংবাদপত্র দৈনিক ইত্তেফাকের মত শীর্ষস্থানীয় পত্রিকার ১৬ পৃষ্ঠার নমুনা। ব্যাঙের ছাতার মত যত্রতত্র ছড়ানো ছিটানো অন্যান্য সংবাদপত্রগুলোর Content analysis করলে আরো কত কী যে বেরিয়ে আসবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব সংবাদপত্রে দেশের মানুষের ক্ষুধা দারিদ্র শোষণ জুলুমের কথা নেই। নেই তাদের জীবন সংগ্রাম আশা আকঙ্খার চিত্র। উল্টো বিনোদনের নামে By color অস্টাদশি রমনীদের আবক্ষ নগ্ন ছবি, পরকীয়া প্রেমের রসালো গল্প, চলচ্চিত্রের নায়ক নায়িকাদের অশালীন ক্রিয়াকর্ম, যৌন কেলেংকারীর কিচ্ছা কাহিনী হরহামেশাই প্রকাশ করে থাকে।

তারা মূল সমস্যা থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ঘুরিয়ে নিতে মাফিয়া চক্রের সহযোগিতায় লিপ্ত। এছাড়া সাহায্য সহযোগিতার নামে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিভিন্ন দস্যু সংস্থা যেমন আই এম এফ, এ ডি পি, বিশ্ব ব্যাংক, বহু জাতিক সংস্থা ও অন্যান্য নামবাহারী এনজিওরা অনুন্নত দেশগুলোতে যে দস্যুবৃত্তি করে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল এই পত্র পত্রিকাগুলো তা ঘুণাক্ষরেও জনগণকে জানতে দিচ্ছে না, বরং এসব শাসন শোষণের নির্মমতাকে সাহায্য সহযোগিতার আবরণে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন ভাবে প্রকাশ করছে যা দেখে দেশের মানুষ এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ভাগ্য নিয়ন্তা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়। উপস্থাপনার কৌশলে ঠুটো জগন্নাথ জাতিসংঘ ও তার কর্মকর্তা কর্ণধার এবং বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্রের রাজা-রাণী, প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রীরা যেন কল্পলোকের তথা বেহেস্তের স্বশরিরী জীবাত্মা! শোষক শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে দেশে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে তা জনগণের আন্দোলন, গণতন্ত্রের সংগ্রাম অভিহিত করে শোষিত মানুষের প্রকৃত সংগ্রামকে বিপথগামী করতে সংবাদপত্রগুলো তৎপর। আন্দোলন সংগ্রামের নামে যা যা ছাপা হয় সে আন্দোলন সংগ্রাম সাধারণ মানুষের নয়। তাহলো শোষক গোষ্ঠীর দুই অংশের মধ্যকার ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, ভাগের কামড়াকামড়ি। ক্ষমতাবানদের ক্ষমতার কাড়াকাড়িকে চালিয়ে দেয়া হয় জনতার লড়াই বলে। আর শ্রমিক কৃষক সর্বহারা শ্রেণীর প্রকৃত লড়াকুদের সন্ত্রাসী চরমপন্থী আখ্যায়িত করে তাদেরকে দমন পীড়নে মদদ যোগানো এই সংবাদপত্রগুলোর অন্যতম প্রধান কর্ম। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শ্রেণী

www.pathagar.com

বিভক্ত সমাজে সংবাদপত্রেরও শ্রেণী চরিত্র শোষক শ্রেণীর। প্রভাবশালী সংবাদপত্রগুলোর মালিকগণ সকলেই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী, কোন না কোন ভাবে তারা গণবিরোধী রাষ্ট্রের ক্ষমতায় আসীন। আবার কেউ কেউ ক্ষমতা থেকে প্রত্যক্ষভাবে বিতারিত হলেও পরোক্ষভাবে এই ক্ষমতার অংশিদার। এই ক্ষমতাবান গণ বিরোধীরা শুধু সংবাদপত্রের মালিকই নন, এসব সংবাদপত্রের গণ বিরোধী ভূমিকাকে সূচারু রূপে সম্পাদনের জন্য টাকার জোড়ে সম্পাদকও বটে। জাতীয় সংসদের ঢাকা-৮ আসন থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাজী মোঃ সেলিমের (তিনি আবার 'ভালবাসা' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতিও) প্রশ্নের জবাবে তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ সংসদকে জানান "ঢাকার ৯৪০টি সংবাদপত্র সম্পাদকের মধ্যে ৬৬২ জনই মালিক সম্পাদক।" বাদবাকী ২৭৫ জন পেশাদার সাংবাদিক হলেও গৃহপালিত জন্তুর ন্যায় অর্থবান মালিকের আজ্ঞাবহ। কায়েমী স্বার্থবাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের শহর বন্দর গ্রাম গঞ্জে প্রচুর পরিমাণ পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। যার সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে জানা যায় সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে (ডি এফ পি) নিবন্ধনকৃত মোট পত্রিকার সংখ্যা এক হাজার ছয়শত ছিষট্টিটি। এর মধ্যে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১১৫টি, সাপ্তাহিক ৩৭৩টি, পাক্ষিক ১৩৭টি, মাসিক ২৮০টি, দ্বি মাসিক ৫টি, ত্রৈমাসিক ৪৮টি, ষান্মাষিক ৩টি এবং বার্ষিক ৬টি। এছাড়া ঢাকার বাইরে মফঃস্বলে দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১৮০টি, সাপ্তাহিক ৩৬৪ টি, পাক্ষিক ২৫ টি, মাসিক ৫৭ টি, ত্রৈমাসিক ১১টি এবং বার্ষিক ২টি। তারপর অর্থবান ক্ষমতাবানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে বেশ কিছু নিউজ মিডিয়া। এসব মিডিয়া ও ছোট বড় পত্রিকার সাংবাদিকরা অনেকেই 'সাংঘাতিক' নামে পরিচিত। তারা যে শুধু বিভ্রান্তিমূলক সংবাদই পরিবেশন করেন তা নয়; অনেকে আবার ঐ সংবাদপত্রকে পুঁজি করে ফয়দা লুটতে ব্যস্ত। সাংবাদিকের নামাবলি গায়ে থাকলে কাউকে কাউকে ব্ল্যাকমেলিং করতে বেশ সুবিধা। এমনকি সরকারী প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তারাও এদেরকে সমীহ করে চলেন। কারণ দুর্নীতিবাজ কর্তাব্যক্তিরা নিজেদের দুঃশ্চরিত্র দুর্নীতির বিষয় ঢেকে রাখতে চান। প্রয়োজনে বখরার লেনদেনও হয়ে থাকে মাঝে মধ্যে। ব্যাকারণের ব্যতিক্রম সংজ্ঞার মত ব্যতিক্রম ধর্মী সাংবাদিক অবশ্যই আছেন। মালিকপক্ষ বা উপস্থিত সরকারের সাথে মত ভিন্নতার কারণে তারা অধিকাংশ সময়ই দমন নিপীড়ন ও হয়রানির শিকার। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে ক্ষমতাসীনরা ট্রাস্ট চালিত সংবাদপত্র, সরকারী প্রচার মাধ্যম এবং গণসংযোগ সংস্থাগুলো হাট দখলের কায়দায় দখল করে নেন। এসব সংস্থার শীর্ষ পদাধিকারী ব্যক্তিগণ

www.pathagar.com

পাচাটা প্রতিযোগিতায় যে যত বেশি পারঙ্গম তার তত বেশি কদর। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধাচারণের অর্থ চাকুরী চ্যুতি ছাড়াও জেল জুলুমের হুমকী প্রদর্শন। ঢাল তলোয়ার হীন নিধিরাম সর্দারগণ নিজেদের নাম সর্বস্ব করেছেন বি এফ ইউজ ও ডিউজকে। সংবাদপত্র শিল্পের এই পরিস্থিতি বিদ্যমান নৈরাজ্যিক অর্থনীতি রাজনীতিরই প্রতিচ্ছবি। সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদের দালাল সামন্তবুর্জোয়া শোষক চক্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের কামড়া-কামড়িতে ভেঙ্গে পরা শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা ব্যবস্থার মত সংবাদপত্রের যে চিত্র জনগণের সামনে, তা সবই বিমূর্ত। জনগণ এ বিমূর্ত দুর্বোদ্ধতার বিশাল আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে দিন দিন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে।

সকল সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদ এবং দেশীয় শোষক শাসকদের শোষণের চিত্র মূর্তভাবে প্রকাশ করে এই নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। প্রয়োজন শোষিত মানুষের শ্রেণী চেতনা শানিত করার জন্য অগ্রসর বিপ্লবী শ্রেণীর সংবাদপত্র। বঞ্চিত নিগৃহীত সাধারণ মানুষকে শ্রেণী চেতনার আলোকে আত্মশক্তিকে উজ্জীবিত করার সংকল্পবদ্ধ প্রগতিশীল রাজনৈতিক সংগঠনগুলোও বাস্তব কারণেই সংবাদপত্র প্রকাশে প্রচারে তেমন আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। অবশ্য কালে ভদ্রে সাময়িকীপত্র হিসাবে প্রকাশিত হলেও একমাত্র অগ্রসরমান ঐ সংগঠনগুলোর কিছু কিছু পত্রপত্রিকায়ই দেশের বিরাজমান সত্যিকার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অবস্থাকে তুলে ধরা হয়। আর্থিক দৈন্যতায় স্থানাভাবের কারণে ঠাসাঠাসি করে হলেও ৯০ ভাগ মানুষের আশা আকাঙ্খা জীবন সংগ্রামের সুস্পষ্ট চালচিত্র ঠাঁই করে নেয় তার পাতায় পাতায়। সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, পুঁজিবাদ, সামন্তবাদের মুখোশ উন্মোচন করতে বিপ্লবী ধারার এই পত্রিকাগুলোর প্রাণান্ত' প্রচেস্টা অবশ্যই একদিন সফলতা অর্জনে সক্ষম হবে। শোষক শ্রেণীর সংবাদপত্রের জাল-জালিয়াতি, মিথ্যাচার, নস্টামিকে রুখতে শোষক শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হতে এবং শোষিত শ্রেণীর রাষ্ট্র কায়েমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিপ্লবী যুদ্ধের আহ্বান সম্বলিত এসব পত্রপত্রিকা যত বেশি সম্ভব নির্যাতিত মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া সকল সচেতন মানুষের কর্তব্য। আপাত: দৃষ্টিতে যতই তুচ্ছ মনে হোক না কেন বিপ্লবী শ্রেণীর এই পত্রিকা সম্পর্কে পদস্খলিত সাংবাদিক, সংবাদপত্র, শোষকদের উদ্দেশ্যে সেই পৌরাণিক কাহিনীর কবিতার ভাষায় বলতে হয়- "তোমাকে রুধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

www.pathagar.com

হে নারী

বাবা আদমের আরাম আয়েস সুখ স্বাচ্ছন্দের বেহেশত বাস খারিজ এবং ঝঞ্ঝাসঙ্কুল পাপ পঙ্কিল পৃথিবীতে নির্বাসনের সমস্ত দায় দোষ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মা হাওয়ার ওপর। নির্দোষ পবিত্র আত্মার মানুষ বাবা আদম বা নর। আর তার সকল বৈশিষ্ট্যের নেতিবাচক মানুষ, মা হাওয়া বা নারী।

নারী অবলা সরলা, আবেগপ্রবণ, অস্থির-চঞ্চলা। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ফেরাতে বিপথগামী করতে ইবলিশ সহজেই তাকে প্ররোচিত করতে পারে। তাই নারী এক অবিশ্বাসী, অনির্ভর, ভয়ঙ্কর চরিত্র। সকল অনিষ্ঠের মূল নারী। এ ধরনের হাজার হাজার কিচ্ছা কাহিনীর সাথে আমরা যুগ যুগ ধরে পরিচিত।

দেশে বিদেশে নারীকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ভাষায় যত কথা, রূপকথা, গল্প-কবিতা, সাহিত্য শিল্প সৃষ্টি হয়েছে, সম্ভবত আর কোন বিষয় নিয়ে তার এক চতুর্থাংশও রচিত হয়নি। এসব রচনা সমূহের মধ্যে নারীকে মানুষ হিসেবে যতটা না, নারীরূপে ততবেশি দেখানোর চেষ্টা করেছেন পুরুষেরা। সমাজে উৎপাদন ব্যবস্থা দখলের সাথে সাথে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ভেঙ্গে পুরুষেরা ক্রমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নারীদেরকে পদানত করে নেয়। এই কাজ এক দিনের নয়, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছে। ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে ধারণা করা যায় নারীকে করায়ত্ব করতে পুরুষদের পাঁচ হাজার বছর বা তারও বেশি সময় লেগেছিল। এই ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত চিরস্থায়ী করার জন্য ধর্মীয় অনুশাসন বিধিবদ্ধসহ সামাজিক পারিবারিক এবং ব্যক্তিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়েছে যথেচ্ছভাবে। অবশেষে সাত্ত্বিক এবং আত্ত্বিকভাবে নারী হয়েছে পুরুষের আশ্রিত অনুগত সেবাদাসী। নারীর নিজস্ব কোন পরিচিতি নেই। বিবাহ পূর্ব বাবার পরিচয়ে সে পরিচিত; বিবাহ উত্তর স্বামীর পরিচয় তার পরিচয়। বাবা স্বামীর উপার্জনে নির্ভর বলে সে প্রত্যক্ষভাবে

www.pathagar.com

পুরুষ আশ্রিত এবং পুরুষ কর্তৃক শাসিত। উৎপাদন উপার্জনের মালিক পুরুষ। নারীত্বের সজ্ঞায় সে শুধু যৌনসঙ্গী, গর্ভধারিনী, গৃহিনী।

যৌন সঙ্গী হিসেবে যৌন সম্ভোগে সে শুধু পুরুষের আজ্ঞাবহ। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা গৌণ বিষয়। পুরুষের ইচ্ছা পুরণই তার ধর্ম। গর্ভধারিণী হিসেবে সে যে সন্তান জন্ম দেয় সে সন্তানের মালিক অভিভাবক তিনি, যার বীর্য সে গর্ভে ধারণ করেছে। গৃহ কাজে নারী প্রতি মূহুর্তে যে সময় ও শক্তি ব্যয় করে তার হিসাব বা মূল্যের কথা অবিবেচ্য। আমাদের দেশে শেষ রাত থেকে শুরু করে মধ্যরাত পর্যন্ত মহিলাদের পরিবারের সকলের জন্য রান্নাবান্না খাওয়া পরা, ফসলের বাড়ীর কাজে বিপুল কায়িক শ্রম দেয়া ছাড়াও হাঁস মুরগী গবাদি পশুর পরিচর্চা সহ বিভিন্ন কাজ করতে হয়। কিন্তু এসবের কোন মূল্যায়ন আমরা করি না। তারা গৃহিনী নামের অন্তরালে পেটে ভাতে গৃহের দাসীর ন্যায় জীবন যাপন করে। স্ত্রী জাতির এই দাসত্ব ঐতিহাসিক ভাবেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এসেছে। স্ত্রীকে প্রচলিত বাংলায় আমরা পরিবারও বলে থাকি। এখনো গ্রামে একজন পুরুষ স্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলতে বলে থাকেন আমার পরিবার। ল্যাটিন ফ্যামুলাস (Famulus) থেকে ইংরেজি ফ্যামেলি (Family) শব্দটি এসেছে। ফ্যামুলাস এর অর্থ দাস বা ভৃত্য। অতএব ফ্যামেলি বা পরিবার বলতে পুরুষ কর্তা ব্যক্তির অধীনে স্ত্রী পুত্র কন্যা দাস দাসীর প্রতিষ্ঠানটিকে বুঝানো হতো। সময়ের বিবর্তনে সামান্য রদবদল হয়ে সেই পরিবারই টিকে আছে। পরিবার নামক প্রতিষ্ঠানটির স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, চাকর-বাকর সকলেই কর্তা ব্যক্তির অনুগত। ফ্যামুলাস বা ফ্যামেলির সেই কলংকময় অধ্যায় আজও প্রত্যক্ষ পরোক্ষ ভাবে সমাজ সংসারে বিরাজমান। আমাদের সমাজ পুরুষ শাসিত সমাজ। তাই নারীর দিকে আমরা পুরুষের চোখ নিয়ে তাকাই। আমাদের চোখে আদর্শ নারীর সংজ্ঞা সুশ্রী ফর্সা, চরিত্রবান, প্রতিপরায়না, ঘরোয়া, সুগৃহিনী। সুশ্রী ফর্সা বলতে আমরা প্রথমেই নারীকে দেখি যৌনপণ্য হিসেবে। চরিত্রবান পতিপরায়না অর্থ এক পুরুষের যৌনসঙ্গে নিষ্ঠাবান থাকা এবং সেই পুরুষের কর্তৃত্বকে স্বীকার করে নেয়া। যেহেতু পুরুষ তাই তার যৌন নিষ্ঠা না থাকলেও দোষ নেই। কিন্তু স্ত্রীর যৌন নিষ্ঠা অত্যাবশ্যকীয়। ঘরোয়া দিয়ে আমরা ঘরের ভেতরের বন্দী জীবনকে বুঝিয়ে থাকি। আর সুগৃহিনীর মানে নিষ্ঠাবান গৃহদাসী।

ওপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যে শিল্পে চলচ্চিত্রে নারীরা উপস্থাপিত হয়। সব কিছুতেই পুরুষকে বীর্যবান, উত্তম, ত্রাণকর্তারূপে প্রতিষ্ঠার নিরলস প্রয়াস। নারী পুরুষ নির্বিশেষে আমরা চেতন অবচেতন ভাবে এসব প্রথার বিধিবদ্ধতায় অভ্যস্থ হয়ে গেছি। নারীরা তাদের

www.pathagar.com

অন্তর্নিহিত শক্তির ক্ষমতা না বুঝার কারণে পদে পদে লঞ্ছিত নিগৃহীত হচ্ছেন। অজ্ঞানতা বশতঃ প্রচলিত ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় অনুশাসনের জগদ্দল পাথরে পিষ্ট বিধ্বস্থ নারী। গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় রজঃশলা নারীকে কী প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী করেছে। সেই শক্তি প্রজনন ক্ষমতা বা গর্ভধারণ। রাজঃশলা নারীকে সন্তান ধারণের উপযোগী করে তোলে। এই প্রজনন ক্ষমতা বা সন্তান জন্ম দানের কারণে নারী দাবি করতে পারে, সে সৃষ্টির আধার। সন্তান সন্ততির অধিকার তারই। দূরভিসন্দির পুরুষ কিছুতেই নারীকে সেই অধিকার দিতে রাজি নয়। তাই নারীর প্রজনন শক্তি বা সন্তান ধারণের ক্ষমতাকে হেয় প্রতিপন্ন করা তার চা-ই। এই বিকৃত মানসিকতায় পুরুষরা নারীর রজঃশলা অবস্থাকে অস্পৃশ্য ঘৃণ্য অবস্থা বলে প্রপাগাণ্ডা চালিয়েছে। সুতরাং পুরুষ সৃষ্ট সকল ধর্মেই নারীর এই রজঃশলাকে অপবিত্র অশূচি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে এই অবস্থা চলাকালীন সময়ে নারীর নামাজ রোজা করা ধর্মগ্রন্থ পাঠসহ পবিত্র স্থানে যাওয়া নিষেধ। হিন্দু ধর্মে বা ধর্মাচারণে এমতাবস্থায় নারী কোন শুভ কাজে অংশ নিতে পারে না। এমন কি রজঃশলা চলা অবস্থায় পতি দেবতার বিছানায় শোয়াও পাপ। তার শয়ন শয্যা আলাদা। রজঃ নিবৃত্তির পর বিভিন্ন আচারের মাধ্যমে তাকে শুদ্ধ হতে হয়। খ্রিষ্ট ধর্মেও অনেক নিষেধাজ্ঞা। নারীর প্রতি ধর্ম-ধর্মাচারের এ ধরনের অসংখ্য বেলাল্লাপনার উদাহরণ আছে। এ সব কিছু উদ্দেশ্য প্রণোদিত, নারীর প্রতি অবিচার। এর লক্ষ্য নারীকে চাপিয়ে রাখা অর্থাৎ পুরুষের অধীনে নত রাখার প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। আরেকটি কথা পুরুষরা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছে যে, নারী দুর্বল, পুরুষ সবল। অতএব সবলের কর্তৃত্ব দূর্বলের ওপর এটা সমাজ স্বীকৃত। প্রকৃত বিজ্ঞান মনস্কতার বিচারে নারী কোন ক্রমেই পুরুষের চেয়ে দূর্বল নয়। আসলে শিক্ষা দীক্ষা আর উপার্জনের সমস্ত সুযোগ থেকে নারীকে বঞ্চিত রেখে পুরুষরা তাদের স্বার্থে মনস্তাত্তিক ভাবে নারীকে দুর্বল করে রেখেছে। প্রশ্ন আসতে পারে উন্নত বিশ্বে শিক্ষাদীক্ষায় জীবনাচরণে অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের সমান সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সেখানেও কেন নারীরা নিগৃহীত নির্যাতিত হচ্ছে? প্রধানত কারণ দু'টি। এক. দীর্ঘ দিনের গড়ে ওঠা পুরুষ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মগজ ধোলাই অর্থাৎ প্রথাগত বিধি বিধানে অভ্যস্ত মন মানসিকতা। দুই. পুঁজিবাদী অর্থনীতি, যার প্রধান লক্ষ্য পণ্য উৎপাদন, মুনাফা অর্জন। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সব কিছুর মত নারীও ভোগ্য পণ্য।

সাম্রাজ্যবাদের অধীনে বাংলাদেশে উৎপাদন ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সাথে নারীদের অধিকারের কথা বিবেচনা করে নয়, পণ্য মুনাফার স্বার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুযোগের ছাড় দেয়া হচ্ছে। যেমন অফিস-আদালতে, কারখানা-দোকানে ও অন্যান্য কাজে নারীরা এখন

www.pathagar.com

অবরোধ প্রথা ভেঙ্গে কাজ করতে পারে। সেখানে তারা স্বাধীনতো নয়ই বরং প্রতি পদে পদে বুর্জোয়া, আমলা মুৎসুদ্দি অর্থ ব্যবস্থার ও পুরুষতন্ত্রের শোষণের শিকার। তারা পুরুষের সমান শ্রম দিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের জন্য নির্ধারিত কম মজুরী বা নারী মজুরী। জীবন ধারণের জন্য কাজ করতে গিয়ে নারী বলে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে ক্ষমতাবান পুরুষ কর্তৃক। আমাদের শোষণমূলক সমাজ ব্যবস্থায় এই নিষ্ঠুরতার বিচার নেই। তাইতো নূরজাহান ফিরোজারা মরে গিয়ে বাঁচে, রাষ্ট্রীয় বাহিনী কর্তৃক দিনাজপুরের গরীব কিশোরী ইয়াসমিন আক্তারের ধর্ষণ ও খুন হওয়ার ঘটনা চাপা পড়ে যায় মিথ্যাচারের আড়ালে। কি নির্মম এই সমাজ! কি নির্মম এই বিচার ব্যবস্থা! নারী মানে ধর্ষণের বস্তু। নারী মানে ফতোয়াবাজের শিকার। নারী মানে ভোগ্যপণ্য।

প্রায় দুই হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে বাৎস্যায়ন প্রণীত 'কামসূত্র' থেকে শুরু করে অদ্যাবধি গাদা গাদা রস সাহিত্য সৃষ্টি হচ্ছে নারীর শরীর এবং যৌন সম্ভোগকে কেন্দ্র করে - "নারীর অসাধারণ দেহ সম্পদ তাবৎ রসিক পুরুষদের এক অভাবনীয় ভোগ ও তৃপ্তির বস্তু।" পুরুষের চোখে- "নারীর জীবনে অনিবার্য ভাবে এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন তাকে একটি সুপক্ক রসালো ফলের মত দেখায়, যে রসপূর্ণ অবস্থা তাকে নারীত্বের তুঙ্গে পৌঁছে দেয়, এবং ঠিক যার পর থেকেই তার মুখাবয়ব এবং দেহে ঢল নামে।"

হে নারী, হে মাতা ভগ্নি কন্যা, আপনাদের নিয়ে এই যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আপনারা আজ রুখে দাঁড়ান। কিসের রক্ষণশীলতা, কিসের হীনমন্যতা? সামন্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার মুক্ত হয়ে জেগে উঠুন। পিতৃতান্ত্রিক, অগণতান্ত্রিক পরিবার প্রথার অবসানের লক্ষ্যে সমাজের সকল নির্যাতিত শ্রেণীর সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যবাদ পুঁজিবাদ সামন্তবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, যুদ্ধে নেমেই আপনাদের প্রকৃত মুক্তি অর্জন করতে হবে। হে নারী, হে মাতা ভগ্নি কন্যা আপনারা জাগুন, জেগে উঠুন।

www.pathagar.com

পরম্পরা মেঘলাদের কথা

মেঘলা, গীতিকাব্য ওর চোখের চাহনি। চাঁদের রঙের জোস্‌না কোমল মিষ্টি হাসি। ওকে দেখে কাব্য করে বলতে ইচ্ছে হয়-

চোখতো নয়, সমুদ্র নীল
হাসিতো নয়, পদ্ম ফোটা ঝিল।

হ্যাঁ, সেই স্নিগ্ধ হাসির পদ্ম ফোটা ঝিলের জলে অবগাহন করে শান্তি পেতে ইচ্ছে হয়। আশা, কত আশা জাগে মেঘলাকে নিয়ে। যেমন আশা স্বপ্ন ছিলো আমাকে নিয়ে বাবা মায়ের। যেমন আশা জন্মেছিলো আমার বাবাকে ঘিরে দাদা-দাদির। দাদা-দাদি মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের আকাঙ্খার অপূর্ণতা নিয়ে। বাবা মার আশাও ব্যর্থ করেছি আমি। মেঘলা এসব কিছুই জানে না। জানার বয়সও হয়নি তার। মাত্র তিন মাসের শিশু। মেঘলা জানে না যে দেশে জন্মেছে তার কি নাম। মেঘলা জানে না এ দেশে প্রতিদিন প্রায় চার হাজার শিশু জন্ম নিচ্ছে অনিশ্চয়তার মধ্যে। মেঘলার জানা সম্ভব নয় অনাহার অপুষ্টির কারণে প্রতি বছর তারই মত লক্ষ লক্ষ শিশু ঢলে পড়ছে অনাকাঙ্খিত মৃত্যুর কোলে। অবশিষ্ট যারা বেঁচে থাকছে এদের অনেককেই পাঁচ বছর বয়সে পা দেওয়ার পূর্বেই আত্ম-সমর্পণ করতে হয় অজ্ঞাত যমদূতের কাছে। বাদবাকি শিশুদের অমানবিক জীবন যাত্রার সাথে আমরা কমবেশি সবাই পরিচিত। প্রতি হাজারে বছরে মরছে ১৫০ জন। আড়াই লক্ষ শিশু মরছে ধনুষ্টংকারে। অন্ধ হয়ে যাচ্ছে পয়ত্রিশ হাজার। মানুষরূপী যমদূতের কবলে বন্দী পুষ্প-শিশুদের নির্যাতন নিপীড়নের সকরুণ চিত্র পত্র পত্রিকায় প্রতিদিন প্রতিনিয়ত। একদিকে অনাহার অর্ধাহারে, অন্যদিকে অশিক্ষা কুশিক্ষায় বেড়ে উঠছে অধিকাংশ শিশু। স্বার্থান্বেষী মানুষের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অপরাধ প্রবণতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে তারা। দেশের গরীব নিঃস্ব সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুদের ভয়াবহ দুরাবস্থার শেষ নেই কোন।

www.pathagar.com

মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুদের অবস্থা কেমন? তারাও কি স্বাভাবিক ভাবে গড়ে উঠতে পারছে? না, সেখানেও এক নৈরাজ্যিক পরিস্থিতির মধ্যে শিশুরা বেড়ে উঠছে। সেখানেও শিশুর ব্যক্তি স্বাধীনতা লুণ্ঠিত। নিজস্ব আশা আকাঙ্খা প্রকাশের কোন সুযোগই দেওয়া হচ্ছে না তাদের। প্রতিবেশী ছেলে-মেয়েদের সাথে পাল্লা দিয়ে নিজেদের চিন্তা ভাবনা মতামতকে শিশুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রতিযোগিতায় নামাচ্ছে শিশুর অভিভাবকরা। অসহায় শিশুকে মুখ বুজে মেনে নিতে হয় পিতা-মাতার অভিভাবকত্ব। সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনে নিজেদের প্রতিষ্ঠা না পাওয়া গ্লানির কলুর ঘানি চাপিয়ে দিতে চাচ্ছেন পিতা-মাতা তাদের নিস্পাপ অসহায় শিশুর ঘাড়ে। পিতা-মাতা শিশুর ভবিষ্যৎ বলতে বুঝেন অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ। তাই সন্তানদের দাবড়ানী দেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও বড় আমলা হওয়ার প্রতিযোগিতায়। কিন্তু শ্রেণী বিভক্ত সমাজে সুবিধাভোগী উচ্চ শ্রেণীর সন্তানদের কাছে স্বভাবতঃই হার মানতে হয় এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আসা ছেলে- মেয়েকে। আর তখনই হতাশাগ্রস্থ ছেলেরা হয় বিচলিত, পথভ্রষ্ট। এই বাস্তবতার কথা বুঝেও অলীক মোহে সোনার হরিণের পিছনে ছুটছে পিতা-মাতা। তারা বুঝেও বুঝতে চান না ব্যক্তির জীবন, ভবিষ্যৎ, নিরাপত্তা সবকিছুই দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সামগ্রিক সমস্যা বাদ দিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠার যতই কসরত করিনা কেন তাতে সন্তানের বা নিজের কারো ভবিষ্যৎ শুভ হতে পারে না। এই বাস্তব সত্যটা প্রতিটি শিশুর অভিভাবককে জানতে হবে।

শিশুর জীবন শিশুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার আগে বর্তমান আমরা কেমন আছি, কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি তা নিয়ে ভাবা দরকার। দানব শাসিত পৃথিবীতে আমরা শোষিত মানুষ। এখানে অনাহারে অচিকিৎসায় প্রতি মিনিটে ত্রিশ জনেরও বেশি শিশু মৃত্যু বরণ করছে। অথচ প্রতি মিনিটে পৃথিবীর সামরিক খাতে ব্যয় হচ্ছে এক হাজার তিনশত মার্কিন ডলার। আমাদের মত উন্নয়নশীল ২৩টি দেশের বার্ষিক শিক্ষা খাতের ব্যয়ের সমান একটি পারমাণবিক সাবমেরিনের মূল্য। অথচ বাংলাদেশের ৭৫ ভাগ লোক নিরক্ষর, অর্থের অভাবে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। প্রায় এক কোটি মানুষ ভিক্ষুকের দশায় জীবন যাপন করছে। সমপরিমাণ মানুষ শিক্ষিত বেকার। আড়াই কোটি লোকের কাজ নেই। প্রায় তিন কোটি মানুষের নিজস্ব জমি বলতে কিছুই নেই। সাম্রাজ্যবাদের দালাল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শাসন শোষণে আমরা বন্দী। শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য সবটুকু সময়ই পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আমাদের শ্রমের ২৫ ভাগের মূল্য নিয়ে আমরা কোন প্রকার দৈহিকভাবে বেঁচে থাকি। বাকি ৭৫ ভাগ শ্রম চুষে নিয়ে শোষকরা গড়ে মুনাফার পাহাড়।

www.pathagar.com

প্রতি মুহূর্তে টানা-পোড়েন, ঘাত-প্রতিঘাতে দ্বন্দ্বে-সংঘাতে উৎপীড়িত আমাদের জীবন। মানসিক বিপর্যয়, বৈকল্য এবং জটিলতা নিত্যসঙ্গী। নিরাপত্তাহীনতায় হতাশায় নিমজ্জিত চারিপাশ।

এই শোষণ নির্যাতন থেকে সর্বাগ্রে মানুষের মুক্তি প্রয়োজন। কৃষকের প্রয়োজন তার জমি, ফসলের নিরাপত্তা। শ্রমিকের শ্রমের মুনাফার অংশিদারিত্ব। প্রকৃতির মধুরতম উপাদান শিশুদেরকে খেয়ে পরে স্বাধীনভাবে বড় হবার সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি মানুষই তার মনের গহীনে এই আশা পোষণ করছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দেশের এই সকল সাধারণ মানুষ অসচেতনার কারণে সংগঠিত নয় বলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন অসঙ্গতি, শোষণ- শাসনের বিরুদ্ধে তাদের অসন্তোষ বৈপ্লবিক আন্দোলনে রূপ নিতে পারছে না। জনস্বার্থ বিরোধী গুপ্ত ঘাতকরা জনগণের মুক্তির লড়াই, ত্যাগ তিতিক্ষাকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ হাসিলের কাজে ব্যবহার করছে।

এই শোষক শাসকদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে বাবা যেমন দাদার আকাঙ্খা পূরণ করতে পারেনি, আমিও আমার বাবার স্বপ্নকে স্বার্থক করতে পারছি না। যদি এই সমাজ রাষ্ট্রের শাসন শোষণের শিকড় উপড়ে ফেলতে না পারি তবে নিস্পাপ শিশু মেঘলার মত লক্ষ লক্ষ শিশুর নিষ্কলুস নির্মল হাসি মুখে চেয়ে যতই সুখ স্বপ্নের আশা ব্যক্ত করি না কেন, তা হবে নিষ্ফল জাপানী প্রবাদতুল্য-

"It looks so tasty
It Makes your mouth water
But you can't eat it
It's only plastic.

না, মেঘলারা প্লাষ্টিক নয়; রক্ত মাংসে গড়া আগামী পৃথিবীর মানুষ। মেঘলাদের জন্য চাই শোষণহীন বিশ্ব, বাসযোগ্য দেশ। আর তা কেবল সম্ভব বিজ্ঞান ভিত্তিক রাজনৈতিক বিপ্লব এবং শ্রেণী সংগ্রাম ভিত্তিক সমাজ বিপ্লবেই।

www.pathagar.com

শ্রমিকের শোষণ মুক্তি প্রসঙ্গে

বিশিষ্ট সাংবাদিক নির্মল সেন গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি দৈনিক বাংলায় উপ-সম্পাদকীয় নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন 'এবার ঈদে নাকি একটি নামী-দামী গার্মেন্টসের একটি মাত্র পাঞ্জাবী বিক্রি হয়েছে ১৮ হাজার টাকায়।' এই পাঞ্জাবী ক্রেতা, নামীদামী গামেন্টস মালিক বা বিক্রেতার চেহারা সুরত শান শওকতের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। এ ব্যাপারে নিবন্ধে বিস্তারিত না থাকলেও আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হয় না তারা কারা, কেমন? কিন্তু ১৮ হাজার টাকার কত শতাংশ পাঞ্জাবীটির কারিগর বা শ্রমিকের ভাগ্যে জুটেছে এ বিষয়ে নিবন্ধে কিছু উল্লেখ নেই। মালিক নামের সাহেব ও বাবুদের আরাম আয়েস ভোগ বিলাস এবং সম্পদের পাহাড় গড়ার কাজে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অহর্নিশ পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারা চিরকালই অনুল্লেখ রয়ে যায়। তাদের পাওনা তো বটেই, এমন কি তারাও অপ্রাসঙ্গিক, এই অপ্রাসঙ্গিক অপাংক্তেয় শ্রমিকদের নিয়ে আমার আজকের প্রসঙ্গ।

আভিধানিক অর্থে শ্রমিক হলো- শ্রমজীবী, শ্রমশীল, পরিশ্রমী। অর্থাৎ শ্রম দ্বারা যে জীবিকা নির্বাহ করে তাকে শ্রমিক বলা হয়। The employment of labour (Standing orders) Act 1965- এ বলা হয়েছে "শ্রমিক অর্থ- কোন দোকানে বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে কোন দক্ষ, অদক্ষ, দৈহিক, কারিগরী, বাণিজ্যিক সংক্রান্ত বা কেরানিগিরি ধরনের কাজ করার জন্য মজুরী প্রদানের ভিত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তি (শিক্ষানবিস সহ), তাহার চাকুরীর শর্ত ব্যক্ত অব্যক্ত যেইরূপ হইয়া থাকুক না কেন।" এছাড়াও যানবাহন, মাটিকাটা, পাথর ভাঙ্গা, ঘর-বাড়ি-ইমারত তৈরি, মাঠে ফসল উৎপাদনে যারা শ্রমের বিনিময়ে জীবিকা নির্বাহ করে তারা এবং রিক্সা চালক, ঠেলাগাড়ি চালক, কুলি-মুটে, হোটেল রেস্তোরায় নিয়োজিত ব্যক্তিকেও শ্রমিক বলা হয়ে থাকে।

শ্রমিকরে বিপরীতার্থক শব্দ মালিক। কোন দোকান বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান,

www.pathagar.com

তাদের উত্তরাধিকারী, বা বংশগত উত্তরাধিকারীগণকে মালিক বুঝানো হয়ে থাকে। মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞাপন প্রচার, কমিশন অথবা মাল চালান দেওয়া ধরনের ব্যবসায়ে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক এজেন্সী, যে কোন কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানী, ব্যাংকিং কোম্পানী, ব্রোকার অফিস, ক্লাব, থিয়েটার, সিনেমা হলে বেতন মজুরীর ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারীরাও শ্রমিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এরা সবাই মালিক তথা মালিকানা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠানের জন্য নিজ নিজ শ্রমদ্বারা পণ্য বা পণ্যসামগ্রীর উদ্বৃত্তমূল্য সৃষ্টি করে থাকে। যার ৯৫ ভাগ মালিকের ভোগ-বিলাস ও আরও সম্পদ সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত। বাকি মাত্র ৫ ভাগ শ্রমিককে বাঁচিয়ে রাখার কাজে ব্যয় ধরা হয়। শ্রমিক তার ন্যায্য মজুরী পায়না বলে বাধ্য হয়ে সে নোংরা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে অর্ধাহারে, অনাহারে মানবেতর জীবনযাপন করে। দারিদ্রতার দুর্বিসহ পরিস্থিতি তার শিক্ষা, জ্ঞান ও সচেতনার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই আমাদের দেশে শ্রমিকরা অধিকাংশ অশিক্ষিত, ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন। সচেতনতার অভাবে তারা অসংগঠিত বটে। শ্রমিক নামের এই মানুষগুলো আসলে কারা? এদের উৎস কোথায়?

গ্রাম বাংলার ক্রমবর্ধমান দারিদ্রতার কারণেই এরা বাধ্য হয়েছে জীবন জীবিকার রূপ বদলাতে। তারা সকলেই গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবারের মানুষ। এরা কৃষক, কামার, কুমার, মৎসজীবী ও অন্যান্য ছোটখাটো স্বাধীন পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সামান্য জমিজমা কমবেশি তাদের ছিলো। কিন্তু উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, উপকরণ, সার, ডিজেল, কীটনাশক ঔষধ এর মূল্য বৃদ্ধি এবং সামন্তশোষণ পদ্ধতির যাতাকলে পড়ে তারা দিনকে দিন দারিদ্রতার চরম সীমায় নিপতিত হতে থাকে। অবশেষে সাম্রাজ্যবাদের চর দেশীয় শোষক এবং গ্রামের মহাজন জোতদারদের শোষণ নির্যাতনের শিকার হয়ে স্ব স্ব পেশা ও জমিজমা ঘরবাড়ি ছেড়ে তারা সামাজিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনদের দলে এসে দাঁড়িয়েছে। অতএব সাম্রাজ্যবাদের অধীনে পুঁজিবাদী অর্থনীতির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমবিক্রি করতে তারা বাধ্য। পুঁজিবাদ এমন একটি উৎপাদন পদ্ধতি যা এ ব্যবস্থায় শ্রমবিক্রি ছাড়া শ্রমিকের অন্যকোন পথ নেই। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশে অসম্ভব সস্তা দামে শ্রম পাওয়া যায়। তাই বিশ্ব পুঁজিবাদের কাছে এদেশের শ্রমিকদের শ্রম অত্যন্ত লোভনীয়। এখানকার শ্রমিকরা অশিক্ষিত, দরিদ্র, ধর্মান্ধ ও ভাগ্য বিশ্বাসী বলে তাদের শোষণ করাও সহজ। পেটের খোরাক এবং পরকালের চিন্তা ছাড়া তাদের আর কোন চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। শ্রেণী চেতনায় সংগঠিত হবার সম্ভাবনাও কম। যদিও শ্রমিক শ্রেণীর সংগঠিত বিদ্রোহের ভয়ে পুঁজিবাদ তাদের আগের শোষণ প্রক্রিয়া বদলে নিয়েছে।

www.pathagar.com

তারা এখন অনুন্নত দেশগুলিতে সরাসরি পুঁজি বিনিয়োগ না করে সেসব দেশের আমলা, মুৎসুদ্দি, বুর্জোয়া গোষ্ঠীর মাধ্যমে শ্রমিকদের ওপর শোষণ প্রক্রিয়া বজায় রেখে নিজেদের ফায়দা লুটে নেয়। সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ এসব দেশীয় শোষক অধিক সম্পদশালী হবার অদম্য কামনায় এদেশের শ্রমিকের শ্রমের মুনাফা পাঁচার করে বিবেকবর্জিত কাজে নিজেদের লিপ্ত রেখেছেন। একজন শ্রমিকের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুর কথাও তারা ভাবেন না। যেন তেন প্রকারে মুনাফা অর্জনই তাদের প্রধান লক্ষ্য। ফলে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় নিম্নতম সুযোগ সুবিধাও এখানে উপেক্ষিত। এমনকি I.L.O- স্বীকৃত পি, এফ, গ্র্যাচুইটি বা নিরাপত্তাজনিত সুবিধার ছিটেফোঁটাও কোন শ্রমিকের জন্য নেই। কাগজে কলমে শ্রম ঘন্টা নির্ধারণ থাকা সত্ত্বেও অনেক কারখানা প্রতিষ্ঠানে দ্বিগুণ সময় কাজ করতে হয়। Overtime- এর নামে যা পাওয়া যায় তা অতি সামান্য। বহু প্রতিষ্ঠানে তাও জোটে না। এখানে Overtime- এর অর্থ জোর জবরদস্তি। শ্রমিককে সামান্য আয় থেকে সংসারে বৃদ্ধ বাবা-মা, চার পাঁচটি ছেলেমেয়ের খাওয়া পরা, ঔষধ পথ্য এবং ঘর ভাড়ার প্রয়োজন মিটাতে হয়। একজনের আয়ে কোন ক্রমেই এতগুলো পোষ্যের চলা সম্ভব নয় বলে শিশু অবস্থাতেই ছেলেমেয়েদের এমনকি তার স্ত্রীকেও উপার্জনের সন্ধানে বের হয়ে ধর্ণা দিতে হয় মালিকের দ্বারে দ্বারে। এই অনিবার্য কারণেই বাংলাদেশে শিশু শ্রমিকের আধিক্য। এছাড়া শিশু শ্রমিকদের শ্রম শোষণে আরও সুবিধা; কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানে শিশু শ্রমিক থাকলে উৎপাদন ব্যয় কমে অর্থাৎ শিশুদের দিয়ে অতিরিক্ত খাটুনি খাটিয়ে কম মজুরীতে বেশি মজুরীর বয়স্ক শ্রমিকের একই কাজ পাওয়া যাচ্ছে। উপরন্তু তাকে শিক্ষানবিস, বদলী, সাময়িক ইত্যাদি বিভাগে রেখে দক্ষ শ্রমিকের স্থায়ী নিয়োগের ঝামেলা থেকেও মুক্ত থাকা যায়। গার্মেন্টস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে পুরুষদের তুলনায় নারী শ্রমিকদের চাহিদাও একই কারণে বেশি। একই কাজে পুরুষ শ্রমিকের তুলনায় নারী শ্রমিকের মজুরী কম।

নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে বাংলাদেশের অধিকাংশ শ্রমিকই ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপের কথা জানে না। দেশের প্রচলিত শ্রম আইন বা বিধি বিধান না জানার কারণে তারা মালিক পক্ষের সাথে শ্রম দরকষাকষির সুযোগ থেকেও বঞ্চিত। আবার অনেক প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়নের কার্যক্রম মালিকের পকেট মোতাবেক চলে থাকে। শ্রমিকের দাবি দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে 'নামজাদা' সংগঠন 'স্কপ'। তারা স্কোপ (Scope)- মত কখনও কখনও নামকাওয়াস্তে দাবি দাওয়া নিয়ে হরতাল, অবরোধের ডাক দেন। সাধারণ শ্রমিকরা সরল বিশ্বাসে দাবি আদায়ের প্রাণপন আকাঙ্খা নিয়ে সেই হরতাল অবরোধে অংশগ্রহণ করে। রেললাইন ওপড়াতে গিয়ে গুলি খায়। আর স্কপের নেতৃবৃন্দ সুগন্ধা বা সচিবালয়ের সুসজ্জিত

www.pathagar.com

শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে সরকারের কর্তাব্যক্তির কাছ থেকে নিজ স্ত্রী বা সন্তানের নামে গোপন চেক গ্রহণের মাধ্যমে হরতাল, অবরোধ প্রত্যাহারের প্রকাশ্য বিবৃতি প্রদান করেন। জন্ম থেকে আজ অবধি 'স্কপ' বুর্জোয়া দলগুলোর লেজুরবৃত্তি করে আসছে। সময় মত তারা বিএনপি আবার সময়মত আওয়ামী লীগ বা জাতীয় পার্টির অঙ্গ সংগঠন। তথাকথিত বাম দলের লোকরা এই সংগঠনের নেতৃত্বে থেকে দালালীর কাজটি সুষ্ঠুভাবেই সম্পন্ন করে থাকে। স্বভাবত-ই 'স্কপ' শ্রমিকদের প্রকৃত দাবি দাওয়ার ব্যাপারে কখনও আন্তরিক হতে পারে না। মূলত এটা বুর্জোয়াদেরই একটি প্রতিষ্ঠান। আমাদের দেশের শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ না হতে পারার আরেকটি কারণ শোষকদের Divide and Rule. শ্রম অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন আইন এবং বিধি বিধানের মাধ্যমে শ্রমিক বিভাজন তো আছেই, তাছাড়া সরকারী বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের শ্রম মজুরীর মধ্যেও রয়েছে বৈষম্য। এ সবই লুটেরা বুর্জোয়াদের কূটকৌশল।

আজকের শ্রমিককে সর্বধ্বংসী এই শোষণ নির্যাতন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে শ্রেণী সচেতনতা বাড়াতে হবে। তাদের বুর্জোয়া নেতৃত্বের অক্টোপাস থেকে বেড়িয়ে আসা দরকার। শ্রমিকদের দাবি শ্রমিকদেরকেই আদায় করে নিতে হবে। সংস্কারমূলক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে শোষণমুক্তি সম্ভব নয়। ইস্যু ভিত্তিক নিজস্ব দাবি দাওয়ার সাথে সত্যিকার মুক্তির জন্য শ্রমিকদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিৎ সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন। মনে রাখতে হবে শ্রম শোষণের মূল শত্রু কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নয়। শ্রম শোষণের মূল ধারক বাহক সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ, আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ। রাষ্ট্রযন্ত্র তাদের রক্ষক। তাই বর্তমান শ্রেণী ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া শ্রেণী নিপীড়ন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা যাবে না। একমাত্র সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মানুষ কর্তৃক মানুষ শোষণের অবসান হতে পারে। এর জন্য সকল নির্যাতিত শ্রেণীর সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিপ্লবী লড়াইয়ের পথে ঝাপিয়ে পড়া চাই। শ্রমিকদের বুঝতে হবে তাদের শত্রু এক দিকে সাম্রাজ্যবাদ অন্যদিকে দেশিয় দালাল আমলা মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি ও সামন্তবাদ।

সাম্রাজ্যবাদের দালাল দেশিয় আমলা মুৎসুদ্দি বুর্জোয়ারা শ্রমিকের রক্ত ঘাম করা উদ্বৃত্ত শত সহস্র কোটি টাকার সিংহভাগ দিয়ে দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের, আর বাকি অংশ নিজেরা লুটে নিয়ে ভোগ বিলাসে মত্ত। তাদের বাহন পাজেরো, মার্সিডিজ, আর বাস প্রসাদোপম অট্টালিকায়। বিনা পরিশ্রমে তারা সকল সম্পদের মালিক। যে শ্রমিক দিনরাত পরিশম করে সৃষ্টি করছে সম্পদ সে শ্রমিক অভুক্ত, রোগে শোকে মুহ্যমান।

www.pathagar.com

মানব সমাজের এই ইতিহাস আজকের নয়, দীর্ঘ দিনের। আদিম সাম্যবাদী সমাজের পরে সমাজ বিভক্ত হয়ে গেল দুইটি শ্রেণীতে শোষক এবং শোষিত। শোষক মালিক আর শোষিত দাস। সমাজের সেই পর্যায়কে বলা হতো দাস সমাজ। পশ্চাৎপদ অঞ্চল থেকে পশুর মত শৃঙ্খলিত করে দলে দলে মানুষকে ধরে নেয়া হতো বেঁচাকেনার জন্য। তাদের হাতে পায়ে শিকল বেঁধে সাজিয়ে রাখা হতো অন্যান্য পশুদের সাথে। ধনীরা তাদের কিনে আনতো শ্রমসাধ্য কাজের জন্য। মালিকের প্রয়োজনীয় সকল শ্রম ভিত্তিক কাজই সম্পন্ন হতো দাস শ্রম ও পশু শ্রমের সমন্বয়ে। দাস নারীরা একদিকে ছিলো শ্রমিক অন্যদিকে শ্রমিক উৎপাদনের যন্ত্র। দাসরা শুধু খেটেই যেতো; যেমন আজকের শ্রমিক। তাদের চাওয়া পাওয়া আবদার অধিকারের প্রশ্ন অবান্তর। আদিম সমাজে দাস প্রথা দীর্ঘদিন চললেও বারবার দাসদের প্রতিরোধ বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়েছে শোষকদের। খ্রিষ্টপূর্ব ৭৩-৭১ অব্দে স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে সংঘটিত হয় ইতিহাসের ভয়ংকরতম দাস বিদ্রোহ। মালিকেরা তা নিষ্ঠুর নিস্পেষণে দমন করলেও অনিবার্য ভাবেই শোষক এবং শোষিতের সংগ্রাম থেমে থাকে নি, থামবেও না কোনদিন। তাছাড়া ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে শ্রমিকরা সকল শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে দখল করে নেয় রাষ্ট্রক্ষমতা। ১৮৮৬ সালে শিকাগোর বিদ্রোহী শ্রমিকদের রক্ত বৃথা যায় নি। সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তে বর্তমানে সাময়িক বিপর্যয় ঘটলেও ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লব এবং মহান নেতা কমরেড মাও সেতুং এর নেতৃত্বে চীনে শ্রমিক কৃষকের বিজয় আমাদের দেশের শ্রমিকদের শোষণ মুক্তির পথে এক উজ্জ্বল দিক নির্দেশনা।

www.pathagar.com

খেলাপী ঋণ সমাচার

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। এ কথা শুধু কথার কথা নয়; বাস্তবতার নিরিখেই এ প্রবচনের প্রচলন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কত কথাই না শোনা গিয়েছিলো। শুনিয়েছিলো সংসদ থেকে পদত্যাগকারী বিরোধী দল। শুনেছিলাম ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ, তাদের আত্মীয়স্বজন সাঙ্গ পাঙ্গদের দুঃসাহসিক লুটপাটের কথা। জানা গিয়েছিলো ভাঙ্গা সুটকেস নামক আলাউদ্দীনের আশ্চর্য প্রদীপের সে কী অবিশ্বাস্য যাদুকরী ক্ষমতা! জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথায় নেই সেই সুটকেসের প্রভাব প্রতিপত্তি! আরো কত নাম ধাম, কত বড় বড় ফিরিস্তি! এইসব তথ্য পদত্যাগকারী ধোয়া তুলসী পাতা বিরোধী দলীয় সূত্রের। ঘোষণা করলেন ক্ষমতায় গেলে প্রথমেই ঐ সব দুষ্টচক্রের সকল দুর্নীতি দুঃশাসনের হিসাব নেবেন কড়ায় গণ্ডায়। জনগণের অর্থ সম্পদ লুটতরাজ আত্মসাৎ এর জন্য শুধু কাঠ গড়ায়ই দাঁড় করাবেন না, শুলে চড়াবার দৃঢ় প্রত্যয়ও ব্যক্ত করলেন বিরোধী দল। শুলে শান দেওয়ার মহড়া দেখে আশ্বস্ত হলো জনগণ। সরকার পবির্তন হলো। সরকারী দল হলো বিরোধী দল। বিরোধীরা বসলেন মসনদে। গাজীর পটের গাজী কালুর যুদ্ধ বর্ণনায় কথকের স্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকলো "লাখে লাখে মারে মর্দ হাজারে হাজার/শুমার করিয়া দেখে গোটা তিন চার"। হ্যাঁ, সেই দুর্নীতি দুঃশাসন লুটপাটের হিসাব নেয়ার বাগাড়ম্বর ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো। সরকার ব্যস্ত হলেন নিজেদের আখের গোছাতে। বিচারতো দূরের কথা, লাল গোলাপ-সাদা রসগোল্লার দোস্তাদোস্তী নামক নতুন কালচার সংযোজিত হলো বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে। কার বিচার কে করে! কাকের মাংস কাক কি কখনো খায়? পাবলিকের মাথায় হাত। যদি তাই হয় তবে এত কিছু করে কি লাভ হলো? কিছুতো অবশ্যই হলো। নতুন সরকার ক্ষমতায় আরোহনের সাথে সাথে রেডিও বাংলাদেশ হলো বাংলাদেশ বেতার। বিবি গোলামের বাক্স হলো বাপ-বেটির বাক্স (টেলিভিশন)। ঝাঁক ঝাঁক হানিফের (মশা) কামড়ে অতিষ্ট মানুষকে দ্বারস্থ হতে হলো

www.pathagar.com

হাসিনার (মশার কয়েল) কাছে। সংসার খরচের বাজেটে সংযোজিত হলো লীগ (মোমবাতি)। প্রতিদিন যে সংসদে ব্যয় ২ কোটি ৩০ লাখ টাকা তা বাড়িয়ে দিয়ে সংসদ সদস্যদের আরো বেশি সুযোগ দানের প্রস্তাবও হলো। আরো হলো করতোয়ার ফলক পাল্টিয়ে নতুন ফলক গণভবন। গণ মানুষের রক্তে অর্থে তৈরী এই গণভবন প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থান। যা নির্মিত হয়েছে ১৫ একর জমির ওপর। প্রধানমন্ত্রীর রাত্রি যাপনের এই সুদৃশ্য ভবনের ভেতরে রয়েছে একটি হেলিপ্যাড, লেক সদৃশ্য বিরাট পুকুর, একটি সেলুটিং বেস, ১৭টি সেন্ট্রি বক্স, ২টি গেইট, ১টি ফিজিশিয়ান কোয়ারটার। এছাড়া গণ রোষের আগাম প্রতিকার প্রতিরোধের প্রস্তুতি পুলিশ ব্যারাকতো আছেই। যার উন্নয়ন, মেরামত ও আনুসাঙ্গিক কাজে ১৩ই জুন '৯৬ হতে ১৯শে আগস্ট '৯৬ পর্যন্ত খরচ হয়েছে ১৯ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৭৬ টাকা মাত্র। এ তথ্য পূর্তপ্রতিমন্ত্রী জনাব আফসারউদ্দীন আহম্মদের। প্রতিমন্ত্রী অবশ্য পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রীর রাজসিক বাসভবনের খরচের হিসাব দিতেও ভুল করেন নি। তিনি বলেছেন- "বেগম খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকা কালে তাঁর বাসভবনের সাজসজ্জা, সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র বাবদ খরচ ও পূর্ত কাজে মোট ব্যয় ৮১ লক্ষ ৩৯ হাজার টাকা। বিষয়টিকে কি বলা যায়, বাঘ ও নেকড়েতে ভাগাভাগি নাকি সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি জানি না! দেখা গেলো আপোসে সব রফাদফা। নির্বাচন পূর্ব হম্বিতম্বি আপসে আপ মিলিয়ে গেল। জনগণ আর কিছুই জানতে পারলো না। সরকার অর্থাৎ তৎকালীন বিরোধী দল সব জানলেও গোপনই রেখে দিলো। ওই নিয়ে বাড়াবাড়ির সাহসও নেই তাদের। গন্ধতো সবার গায়েই। তবে ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠানগুলো বুঝে হোক না বুঝে হোক নিজেদের অপকর্ম দায় দোষের ভার লাঘবার্থে কিছু কিছু অপ্রিয় তথ্য ফাঁস করে দিচ্ছেন। সে সুবাদে ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান সমূহের বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা কিছুটা অবহিত হতে পারছি। ১২ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ১৫৬ জন ব্যক্তির কাছে প্রায় ৫,০০০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ অনাদায়ী পড়ে রয়েছে। এই ঋণ খেলাপীরা অধিকাংশই নামজাদা শিল্পপতিতো বটেই। তবে নামকাওয়াস্তে শিল্প গড়ে তোলেন। সেসব শিল্প কলকারখানা দেশের সার্বিক অর্থনীতিতে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে কোন প্রভাব রেখেছে বলে দেখা যায় নি। তারা ফটকাবাজ শিল্পপতি। শিল্পের নামে ব্যাংকের টাকা লুটপাটই তাদের আসল উদ্দেশ্য। কোন না কোনভাবে তারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে তাদের ভূমিকাও খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। ১৩০০০ কোটি টাকার সমগ্র ব্যাংক ঋণের ৭৫ ভাগ পাওনা রয়েছে ১৮০০ ব্যক্তির নিকট। ১লা জানুয়ারী '৯৭ দৈনিক বাংলায় প্রকাশ; বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর লুৎফর রহমান সরকার বলেছেন- "গত ২৫ বছর বিদেশ থেকে ৬৫

www.pathagar.com

হাজার কোটি টাকা এসেছে । এ টাকা কোথায় গেছে তা বোধগম্য নয়।" তবে তিনি এও বলেছেন- "এই বিপুল পরিমাণ টাকা সাহায্য ও ঋণ হিসেবে আসার পরও দেশের জনগণের দারিদ্র কমেনি। ফলে যে শিশু আজ জন্ম নিচ্ছে তার ঘাড়ে চাপছে ৫ হাজার টাকার ঋণ।" বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর আরো জানান- "দেশের ৭০ শতাংশ খেলাপী ঋণ মাত্র ২২ জন লোক দখল করে আছে।" ১৩০০০ কোটি টাকার সমগ্র ব্যাংক ঋণের ৭৫ ভাগ অর্থাৎ ৯৭৫০ কোটি টাকা যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাছে পাওনা তারা কারা? গত ২৫ বছরে যে ৬৫ হাজার কোটি টাকা বিদেশ থেকে এসেছে তা কার নির্দেশে কার স্বার্থে কোথায় গেলো এ কথা জানার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের রয়েছে। আজ যে শিশু জন্ম নিচ্ছে কোন্ অপরাধে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হলো ৫ হাজার টাকার ঋণের বোঝা? এসব প্রশ্নের জবাব নেই। কে দেবে এর জবাব?

গালভরা বুলি আউড়িয়ে ক্ষমতা পেয়ে শক্তি সঞ্চয় করে মুষ্টিমেয় কিছু লোক ব্যাংক, অর্থলগ্নী সংস্থাগুলো থেকে ঋণের নামে এই অর্থ লুটপাট করেছে, করছে হরিলুট। এই ঋণ পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও তাদের আত্মিয়তার সুবাদে কিছু লোক। এই ঋণ নিয়েছেন রাজনৈতিক ক্ষমতাবানরা। এ দুর্নীতির সাথে জড়িত পত্রিকার মালিক থেকে শুরু করে আমলা মন্ত্রী মহোদয়গণ। মন্ত্রী ও আমলারা ক্ষমতাকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদবৃদ্ধির জন্য টাকা কামাবার যন্ত্রে পরিণত করেন। তারাই দেশের অধিকাংশ তথাকথিত বড় বড় শিল্প কল কারকানা, কনষ্ট্রাকশন, কনট্রাকটরী, আমদানী-রপ্তানী প্রতিষ্ঠানের মালিক। নামে বেনামে তারা ব্যাংকের টাকা নিয়ে খেলাপী ঋণের বোঝা দিয়েছেন জনগণের ওপর। সাধারণ মানুষ না খেয়ে মরে গেলেও তার সাধ্য নেই ব্যাংক ঋণ বের করে। যৎসামান্য কিছু কৃষক যারা দু'পাঁচ হাজার টাকা কৃষি ঋণ নিয়েছেন, বন্যা খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে সর্বশান্ত হয়ে সেই ঋণ ফেরৎ দিতে না পারায় তাদের গরু বাছুর ঘটিবাটি ক্রোক হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা গরীব কৃষক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ভিটে ছাড়া করেছে পুলিশ প্রশাসন। এ জাতীয় হৃদয় বিদারক নিষ্ঠুর ঘটনা যত ঘটছে তার সিকিভাগও জানতে দেয়া হয় না দেশের মানুষকে। তবু পত্রিকায় যৎসামান্য যা প্রকাশিত হয় গা শিউরে ওঠে তা দেখে। অথচ কোটি কোটি শত কোটি টাকার ঋণ খেলাপীরা দিব্যি বুক ফুলিয়ে চলছেন। শুধু চলছেন বললে ভুল হবে, তারা তাদের খেলাপী ঋণ রি-শিডিউল করিয়ে আরো ঋণ আদায়ের রাস্তা করে নিচ্ছেন। খেলাপী ঋণের পরিমাণ দিনকে দিন বাড়ছে। ঋণ খেলাপী কারও জেল জরিমানা মালামাল ক্রোক হয়েছে বলে কেউ বলতে পারেন না। বরং একটি ব্যাংকে যিনি ঋণ খেলাপী, অন্য ব্যাংক থেকে তিনি ঋণ পাচ্ছেন স্বাচ্ছন্দ্যে। এই পুকুর চোর ঋণ গ্রহীতাদের জন্য ঋণের টাকার পসরা সাজিয়ে বসে থাকেন ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থলগ্নী

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ। এই ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ প্রদানকারী ব্যাংকারদের আলাপ আলোচনা ও লেনদেন-এর জন্য দেশের বিভিন্ন বাণিজ্যিক শহর সহ ঢাকার মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকায় যুৎসই কিছু সেন্টার গড়ে উঠেছে। সেগুলোর মধ্যে আছে নামকরা কিছু রেস্তোরা, যেখানে এক পিস মাছের দাম ১০০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা। কলাভর্তা, চিংড়ি ভর্তা, ডিমসিদ্ধ, করলা ভাজির বাঙালি সাধারণ খাবারের দাম নাইবা বললাম। এ রাজসিক হোটেলগুলোতে ব্যাংক কর্মকর্তা কর্মচারীদের লক্ষ্যণীয় ভীড়। পছন্দসই খাবারের অর্ডার করেন তারা, আর সেসবের মূল্য পরিশোধ করতে পেরে ধন্য হন ব্যাংক ক্লায়েন্ট। ব্যাংকের ঋণ মঞ্জুরীর জন্য এ এক অপরিহার্য রুটিন। এ সব হোটেল ছাড়া ফাইভ ষ্টার থ্রিষ্টারে আপ্যায়নও বিচিত্র কিছু নয়। খাওয়া দাওয়াতো ভদ্রতার ব্যাপার। নগদ লেনদেনের বিনিময়ে বন্ধকের জন্য নির্ধারিত জমির ডিসপুট দলিল ফকফকা ফ্রেস। একলক্ষ টাকা যে জমির মূল্য তা ত্রিশ লক্ষ টাকার জমি বলে মর্টগেজ রাখা যায়। তার বিনিময়ে মঞ্জুর করা হয় এক কোটি টাকা ঋণ। আমদানীকৃত যন্ত্রপাতির আসল মূল্য যাই হোক দ্বিগুণ দেখিয়ে ব্যাংকের দ্বিগুণ ঋণ আদায়ও স্বতঃসিদ্ধ বিষয়। এমন কি ঋণ আবেদনকারীর এই প্রজেক্ট অ্যাপ্রেইজও তৈরী করে দেন ব্যাংককারগণ। মজার ব্যাপার ঋণ আবেদনকারীর এই প্রজেক্ট অ্যাপ্রেইজ পরীক্ষা নিরীক্ষা, আর্থিক বিচার বিশ্লেষণ এবং তার অনুমোদন কর্তৃপক্ষও তারাই। ক্ষমতাবান ব্যক্তির জন্য যারা নিষ্ঠার সাথে এরূপ কাজ করে দেন; আর্থিক পুরস্কার ছাড়াও তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। ঠুটো জগন্নাথ অর্থঋণ আদালত ওসব কিছু জানেন না, জানতেও চান না। তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয় খেলাপী ঋণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নয়, আদালতের কর্মকর্তা কর্মচারী আইনজীবী ও সাঙ্গপাঙ্গদের কিছু পাইয়ে দেওয়ার জন্য, তাদের পকেটেও কিছু যায় কিনা কে জানে? সাধারণ ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতা যাদের অর্থের জোর কম, প্রশাসনে মামা চাচা নেই, আইনের ফাঁক ফোকড় সম্বন্ধে অজ্ঞ, তারাই এ অর্থঋণ আদালতের কোপানলে পড়ে সর্বশান্ত হচ্ছেন। লোক দেখানোর ষ্টান্টবাজির জন্য গভর্মেন্ট ঋণ খেলাপীর প্রকৃত কারণ উদঘাটন না করে যাদের ধনবল, ক্ষমতা বল নেই সে শ্রেণীর দু' একজন ঋণ খেলাপী ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাকে বলির পাঠা করেন। আর বড় বড় শিল্পপতি যারা দেশের পুরো খেলাপী ঋণের গ্রহীতা তারা যথাযথ অবস্থানে যথার্থই থেকে যান। তাদের সমুদয় সাধারণ সুদ, একশত ভাগ দন্ড সুদ মওকুফ হয়ে যায় রাতারাতি। জনস্বার্থ বিরোধী সরকার সে ঋণ খেলাপীদের সব ঋণ রিসিডিউল করিয়ে নিয়মিত করে নেন নিজেদেরই স্বার্থে। বাহ কী চমৎকার ব্যবস্থা। সাধে কি আর বলে-

বড়লোকের লীলা খেলা
জুচ্চোরী গরীবের বেলা।

www.pathagar.com

আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়

আফসোস কবি নামধারী বাংলা কাব্য জলাশয়ের ক'টি চুনোপুটির জন্য। আফসোস অখ্যাত খ্যাতি-প্রার্থী ক'জন রোমিও ব্যবসায়ীর জন্য। ইস্ তাদের কী ছুটোছুটি। বোগলদাবা প্রেম পত্র বয়ে ছুটলেন নাজিম উদ্দীন রোডের কারাফটক, এলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, গেলেন হবু শ্বশুর বাড়ির এ্যম্বাসি এ্যম্বাসেডারের কাছে। পত্র-পত্রিকা, সাংবাদিক-সংবাদ মাধ্যম, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোন কিছুই বাকি রাখলেন না তারা। তাদের ভাবখানা এই- 'বলাতো যায় না আহা ভাগ্যে থাকলে ঠেকায় কে?' ভাগ্যের অবধারিত পরিণতি ঠেকলো। ঠেকালো ফার্মেসীর মালিক কর্মচারীবৃন্দ। সম্ভবত দেশের ফার্মেসী মালিকদের উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বেশ কিছু আত্মহত্যা ঠেকানো গেলো। হয়তোবা তাদের তড়িৎ সিদ্ধান্তের কারণে ব্যর্থ প্রেমিকদের আত্মহননের সহজ উপায় সিডাকসিন, রিলাকজিন, ইন্‌কটিন, সেডিল, ইজিয়াস, কষ্টিক, বিশটপ, নকটিন জাতীয় ছ্যাক খাওয়া পিল সমূহের বেঁচা কেনা ক'দিন বন্ধ ছিল। নয়তো সাংবাদিকদের চলতি দায়িত্বের পরও ঘাড়ে এসে পড়তো বাড়তি ঝামেলা। পত্রিকাগুলোর নিত্যদিনের সিডউলভুক্ত মরা খবরের সাথে সংযুক্ত হতো এই ব্যর্থ প্রেমিকদের আত্মহত্যার সচিত্র প্রতিবেদন। অবশ্য তাতে পত্রিকা মালিকদের টুপাইস ইনকামও বাড়তো। না, তেমন কিছুই হলো না। আফসোস পত্রিকাগুলোর জন্যেও। আফসোস আরো আছে। বাংলাদেশ বিচার বিভাগের পালের গোদা উনাদের জন্য আফসোস, বড় আফসোস। যাদের দীর্ঘ দিনের শ্রমনিষ্ঠ সাধনালব্ধ পুরুষালী পোষাকী ব্যক্তিত্বের পাহাড় মার্কিন কংগ্রেসম্যান রিচার্ডসনের মাত্র কয়েক ঘন্টার ঝটিকা মিশনের এক ধাক্কায় চিচিং ফাঁক। ভাগ্য ভাল ২৯শে জুলাই জজর্কোট, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের জানালা দরজা, সদর দরজা আটকানো ছিল। মুক্ত এলিয়েদার জন্যে নিজেদের দুঃখ কষ্ট ব্যর্থতার আত্মবিলাপ চার দেয়ালের ভেতরই ঘুরেছে। খোদা মালুম এতে কে কতটা সুখ বা দুঃখ পেলেন। তবে আমি আমার বুক ভাঙ্গা প্রতিক্রিয়াকে কিছুতেই চেপে রাখতে

www.pathagar.com

পারিনি। ৩১শে জুলাই পত্রিকার পাতায় যখন দেখলাম মার্কিন একবিংশ বর্ষী এলিয়েদা সুন্দরী সুর্দশন মার্কিন কংগ্রেসম্যান রিচার্ডসনের সাথে সুপরিসর বিমানের সিড়িঁতে দাঁড়িয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কালে গর্বিত হাত উঠিয়ে বাংলাদেশের বার কোটি মানুষকে টাটা বাই বাই করছে, তখন আমার দেশের ব্যর্থ আইনজীবী; ব্যর্থ বিচারপতি এবং ব্যর্থ প্রেমিকদের আত্মা আমাকে ভর করে বললো 'আমার বধূঁয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া'। এই অনুভূতি দীর্ঘশ্বাস ছিল শুধুই মনে, অন্তরের অন্তঃস্থলে। খুব টাচি ব্যাপার বলে হয়তো স্বরযন্ত্র জিহ্বা বা ঠোঁট Catch করে ফেললো সহজে। পৌঁছে গেল ইথারে। ইথার থেকে পাশে বসা বন্ধুর কানের গহব্বরে। রিয়েলিষ্টিক বন্ধু গম্ভীর স্বরে বললেন- নপুংসক পুরুষের পরিণতি এমনই হয়। এদের জন্য দুঃখ বা আফসোস করে লাভ নেই। নপুংসক শব্দটির সাথে আমার পরিচয় ইদানিং কালের। গাঁ গেরামে খেটে খাওয়া সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠা মানুষ। শহরে এসে অনেক কষ্টে দাঁত মুখ ভেঙ্গে শুদ্ধ বলা শিখেছি। আগে অনেক শক্ত শক্ত শব্দ, কঠিন কঠিন ভাষা শুনে থ মেরে যেতাম। বহু শব্দের অর্থ না বুঝলেও বিজ্ঞের মত মাথাটা নেড়ে নেড়ে নিজের অজ্ঞতাকে ঢেকে রাখার সে কি চেষ্টা! একদিন বুঝলাম শহরের ওমলেট, গ্রামের আণ্ডা ভাজার মত নপুংসক শব্দের অর্থ হিজড়া। তবে এটাও এখন বুঝে গেছি নপুংসক বা হিজড়া শব্দের অর্থের ব্যাপ্তি একালে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ভাগ্যিস রক্ষা, বাংলা সাহিত্যের প্রবাদ পুরুষ সৈয়দ মুস্তবা আলী মানে মানে মরে গিয়ে বেঁচেছেন। শুনেছি তাকে হিজড়া সম্পর্কে গবেষণার জন্য পিএইডি ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল। আমি নিশ্চিত আজকের এই যুগে আমার বন্ধু কথিত নতুন হিজড়া বর্জিত সেই থিসিস কোন ক্রমেই ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়ার উপযোগী বলে বিবেচনায় আসতো না। যাকগে, যারা ছাত্রং অধ্যায়ং তপঃ এর দলে এবং যারা পিএইচডি করার জন্য যুৎসই সাবজেক্ট খুঁজে বেড়াচ্ছেন তাদের চিন্তায় এই নতুন হিজড়াদের বিষয়টি রেখে দিলাম।

আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড় মোটা বুদ্ধির মানুষ। মোটা দাগের কথা বুঝি। সেই কোন কালে কি প্রসঙ্গে বাপ দাদার মুখের একটি কথা 'হাকিম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' মনের গহীনে যে দাগ ফেলেছিলো, সে দাগই ছিলো বিশ্বাসের ঠিকানা, চলার নিশানা। এই পথ চলতে গিয়ে কখনো যে থমকে দাঁড়াতে হয়নি তা নয়। হাকিম সাহেবদের হুকুমের দণ্ড বেড়ি ভেঙ্গে আমার বিশ্বাসী চোখকে কাচকলা দেখিয়েছেন আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টি-বিএনপি নেতা মওদুদ আহমদ, আওয়ামী লীগ-জাসদ-ভাঙ্গা জাসদ নেতা আ স ম আবদুর রব, অসংখ্য খন্ড বিখন্ডিত দলের মধ্যমণি কাজী জাফর, জয়নাল হাজারী সহ জাদরেল নেতৃবৃন্দ। ইদানিং কাচকলা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে লাইম লাইটে আসছেন

www.pathagar.com

আখতারুজ্জামান বাবু, নাজিউর রহমান মঞ্জু গং। এছাড়া রঙিন ঝলমল ফ্ল্যাশ লাইটে বসে আছেন জাতীয় সংসদ ভবনের শোভা বর্ধক আলহাজ্ব হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ। এত কিছুর পরও আমার পথ চলা একেবারে থেমে যায় নি। মোটা মাথার মোটা বুদ্ধি আমাকে বুঝিয়েছে-রাজনীতির ব্যাপার স্যাপার। কত কি-ই-তো ঘটে, ঘটতে পারে। যাক ওসব না হয় ছেড়েই দিলাম। কিন্তু দুই দশ আট তারিখের এত বড় একটা ঘটনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াটা কি ভুল যে, হাকিম তো বটেই, হাকিম হুকুম দুটোই বাচ্ছা পোলাপানের হাওয়াই বাবল খেলনা। হাওয়ায় উড়ে, হাওয়ায় নড়ে, হাওয়ার তোড়েই ফুস্। বিষয়টি খোলাসা করেই বলি।

১৯৯২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি। জুরিখগামী একটি ফ্ল্যাইট ঢাকা বিমান বন্দরে টেক অফ এর জন্য প্রস্তুত। সেই মুহূর্তে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৩ কেজি ২৭০ গ্রাম হেরোইন সহ মার্কিন তরুণী এলিয়েদাকে গ্রেফতার করা হলো। তারপর তাকে নিয়ে সে কি উত্তেজনা, টানটান উত্তেজনা। ছোট কালের রাক্ষস খোক্কোস গল্পের মতো- হালুমলো খেলুম লো মানুষের গন্ধ পেলুম লো। এই উত্তেজনা বিমান বন্দর, কাষ্টমস অফিস, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে শুরু করে থানা, হাজত, জজকোর্ট, হাই কোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। এজলাসে, কোর্টে, দরবার হলে একের পর এক অংকের অভিনয় চললো এলিয়েদা যাত্রার। আইনজ্ঞ, আইনবিদ, জজ, দায়রা জজ থেকে শুরু করে হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ, এমন কি সর্বোচ্চ বিচারপতি সাহেবকেও রাতের পর রাত জেগে ভল্যুম এর পর ভল্যুম আইন পুস্তক ঘেটে পাঠ মুখস্থ করতে হয়েছে। কত অংক অভিনীত হওয়ার পর এলিয়েদা-যাত্রা ভঙ্গ হলো তার পরিসংখ্যান জানলে হয়তো হিসাব করে বের করা যেতো এই যাত্রা বা নাটকের পাণ্ডুলিপির কাগজ সাপ্লাই দিতে কর্ণফুলি পেপার মিলের কত জন শ্রমিক কত শ্রম ঘন্টা অতিরিক্ত কাজ করেছেন। এছাড়া কোর্ট কাচারী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের টাইপ মেশিন, ফ্যান, এয়ার কন্ডিশনার, চেয়ার, টেবিল, বিল্ডিং ইত্যাদির ডেপ্রিশিয়েশন শতকরা কত ভাগ হয়েছে তা বের করাও কঠিন হতো না।

অবশ্য এ নাটকের যথাযথ স্বাভাবিক সফল সমাপ্তি হলে এত সব হিসেব নিকেষের প্রশ্ন আসতো না। নাটকের সময়কাল নির্ধারিত ছিল এলিয়েদার যাবৎ জীবন। কিন্তু তিন বছরের মাথায় হঠাৎ যবনিকা পতনের প্রেক্ষিতে দর্শক শ্রোতাদের এই হিসেব চাওয়াটা কি খুব অসংগত কিছু? এক দর্শক তো খিস্তি করে বললেন- "দেশের আইন কানুন সম্পর্কে আজকের আইনজীবীদের সুস্পষ্ট ধারনা একেবারে কম। তারা হয়তো জানতেনই না, নাটক

www.pathagar.com

যাত্রার ফাল ফালানি বন্ধ করার জন্য দেশে অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন নামে একটা কালা কানুন রয়েছে। সেই অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের মারপ্যাচে ফেলে এতকাল সংস্কৃতি কর্মীদের ধোলাই করা হতো। আর তা করা হতো এই আইনজীবী বিচারপতিদের মাধ্যমেই। এবার বুঝ্ ঠেলা।" বিজ্ঞ দর্শকের কনফিডেন্স দেখে আমিও বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের বলেই হয়তো এলিয়েদা- যাত্রার এই লণ্ডভণ্ড অবস্থা। না, পরে দেখলাম বাংলাদেশের সংবিধিানে ৪৯ অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে মহামান্য প্রেসিডেন্ট বাহাদুরের হস্তক্ষেপে এই লণ্ডভণ্ড কারবার। এখানেও প্রশ্ন, অবশ্য এ প্রশ্ন আমার। যদি মহামান্য প্রেসিডেন্টের মনে তলে তলে এই ছিল তবে বিচারের নামে এত শত আচার উপচারের আয়োজন কেন? কত দিন কত মাস কত বছর কত কি আব্দার অনুরোধ। কোন কিছুতেই প্রেসিডেন্টের মন গললো না। কম বয়সী অবুঝ কচি খুকীর প্রতি হঠাৎ তার এই মমতা উছলে ওঠার কারণটা কি? আমার প্রশ্নের প্রেক্ষিতে যুক্তিবাদী বন্ধুর জবাব 'অন্তরে অন্তরে'। একটা সিরিয়াস বিষয়ে তাঁর এ ধরনের জবাব শুনে রেগে উঠতেই তিনি বললেন- "আরে বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি অনুষ্ঠানের নাম' অন্তরে অন্তরে'।" বললাম- টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের সাথে এর সম্পর্ক কি? আমার রাগের ওজন বুঝে স্বল্পবাক বন্ধু এবার বেশ লম্বা লম্বা বাক্য গঠন করলেন পুরো বিষয়টিকে আমার বোধগম্য করানোর জন্য। বললেন- অন্তরে অন্তরে অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হলো ছবিতে আমরা যাদের গান গাইতে দেখি, আসলে তারা গাইয়ে নন। নেপথ্যে আসল গাইয়েদের গাওয়া গানে তারা শুধু মুখ নাড়েন। আর আমাদের দেশের মন্ত্রী মিনিষ্টার প্রেসিডেন্টও তাই। তাদের কথা এবং কর্মে সাম্রাজ্যবাদী দেশের ইচ্ছা অনিচ্ছা প্রতিফলিত। পত্রিকায় দেখেন নি মার্কিন প্রেসিডেন্ট এলিয়েদার মুক্তির বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এতক্ষণে আমার যুক্তিবাদী বন্ধুর অন্তরে অন্তরে বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হলো।

সম্মানীত পাঠকবৃন্দ, আপনারা হয়তো অনেকে আমার প্রতি রুষ্ট হচ্ছেন। আপনাদের চিত্ত বেদনার কারণ একটি মানবিক বিষয় এবং দেশের একটি সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান নিয়ে আমার এই অনাধিকার রঙ্গব্যাঙ্গ। আপনাদের কাছে করজোরে ক্ষমা চেয়ে জানতে চাচ্ছি ছিঁচকে চুরির অপরাধে এদেশের সহজ সরল মানুষগুলোকে যখন দাগী আসামী বানিয়ে জেলে পুরে রাখা হয়, সেটা কি মানবিকতার দাবি রাখে না? গরীব অসহায় কিশোরী যুবতীদের যখন গৃহাভ্যন্তরে দাস বৃত্তিতে বন্দী করে তাদের ওপর নির্মম শারীরিক মানসিক নির্যাতন চলে তা কি মানবিকতার দাবি রাখে না? সারের দাবিতে মিছিলে গিয়ে গাঁয়ের কৃষকটি যখন বুলেট বেয়নেটের খোঁচায় ক্ষত বিক্ষত হয়, তখন মানবিকতা কোথায় থাকে? তালা শিকলবদ্ধ

www.pathagar.com

নব্য কারাগার গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরিতে যখন শ্রমিক নারী পুরুষের জীবিত দেহ চিতাভস্ম হয় তখন মানবিকতা কোথায় থাকে? এই সে দেশ, যেখানে অসহায় মা ক্ষুধার্ত সন্তানদের মুখের দু'মুঠো ভাত জোগাতে, ভাই তার বিবাহ যোগ্য বোনের যৌতুকের দাবি মিটাতে অপরাগ হয়ে কিছু একটা করে বছরের পর বছর জেলে পঁচে। এই সে দেশ, যেখানে সোনার টুকরো ছেলেগুলো শোষণ জুলুমের প্রতিবাদে নেমে সন্ত্রাসী চরমপন্থী আখ্যা পেয়ে জেলজুলুমে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে। এই সে দেশ, যেখানে মৃত্যুদণ্ডে শাস্তিযোগ্য এক ভয়ঙ্কর অপরাধীকে মানবিকতার দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। বাহ্ কী চমৎকার মহানুভবতা! এর চেয়ে বড় রঙ্গব্যাঙ্গ আর কিছু হতে পারে? হায়রে মানবতা, হায়রে মহানুভবতা!

মাদক ব্যবসা মানবতা বিরোধী গর্হিত একটি কাজ। সকলেই জানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তৃতীয় বিশ্বের দেশের মানুষকে গিনিপিগ হিসেবে ব্যবহার করছে। তাদেরই প্রত্যক্ষ পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এসব দেশে মাদকের রমরমা ব্যবসা, জমজমাট বাজার। তারা নেটওয়ার্কের মাধ্যমে মাদকাসক্ত বিস্তার করে সম্ভাবনাময় যুবশক্তিকে সমূলে বিনষ্ট করার কাজে লিপ্ত। যারা মাদকাসক্ত তাদের মানবিকতা, নৈতিকতা এবং দায়িত্ব কর্তব্যবোধ বলে কিছুই থাকে না। সমাজ সভ্যতা ও মানব জাতিকে ধ্বংস করে দিতে মাদক দ্রব্যের কার্যক্ষমতা আণবিক বোমার চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। মাদক দ্রব্য পাচার তথা মাদকাশক্তি বিস্তারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকা একটি মানবিকতা বিরোধী ধ্বংসাত্মক কাজ। এর সাথে যারা যুক্ত তারা বিশ্ব মানবতার শত্রু। মানব জাতিকে রক্ষা করতে হলে এই চিহ্নিত শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি একান্তভাবে অপরিহার্য। দেশ-কাল-জাতি-বর্ণ-গোত্র ভেদে সকল সচেতন মানুষের এটাই কামনা।

৩ কেজি ২৭০ গ্রামের বিরাট চালানের হেরোইন সহ বাংলাদেশে হাতে নাতে ধরা পড়লো শ্বেতাঙ্গিনী এলিয়েদা। তাঁকে ছাড়ানোর জন্য তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো আইনের ফাঁক ফোঁকর। না, কিছুতেই কিছু করা গেল না। ঢাকার অতিরিক্ত দায়রা জজ মার্কিন নাগরিক এলিয়েদা ম্যাকর্ড ও নাইজেরিয়ার নাগরিক রবার্ট ব্লক্সন টনীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। এই শেষ নয়। এলিয়েদার দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল দায়ের করা হয়। হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ কোথাও একটু ফাঁক পেয়ে এলিয়েদার কারাদণ্ডের মেয়াদ হ্রাস করে তাকে মুক্তির আদেশ দিলেন। আবার শুরু হলো এজলাসে দরবারে এমনকি বিচারপতির বাসভবনে আইনী যুদ্ধ। না, এলিয়েদার

www.pathagar.com

চামড়া হোয়াইট হলেও তাঁর হেরোইন পাচারের কর্মটি কিছুতেই হোয়াইট করা গেল না। প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগও বিশ্বমানতার শত্রু এলিয়েদার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। এখানেও প্রমাণ করা গেলো না এলিয়েদা নির্দোষ। মানবিকতা বিরোধী অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত আসামীকে মানবিকতার অজুহাতে মুক্তি দেওয়া কত অমানবিক কাজ তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

এই হেরোইন কারবারী তরুণীর জন্য বাংলাদেশের দৈনিক সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর সেই কী প্রচার প্রোপাগাণ্ডা। তাকে অভিসিক্ত করা হলো 'হার্টথ্রব' বলে। তার নামের অদ্যে বিশেষণ যুক্ত হলো অনিন্দ্য সুন্দরী। বলা হলো নিষ্কলুস মুখাবয়ব। আরো কত কী! বাংলাদেশের মানুষের মুসলিম সেন্টিমেন্টের সহানুভূতি আদায়ের উদ্দেশ্যে কারাগারে এলিয়েদার নামাজ পড়া, কোরআন শরীফ পাঠের কিচ্ছা কাহিনী ছড়িয়ে তাকে ইসলামী করণের চেষ্টাও কম হয়নি। কবি নামধারী ও অন্যান্য ভ্রষ্ট যুবকদের কীর্তি কর্মের কথা আর নাইবা বললাম। এবারে আসি কোটিতে একের কথায়। জ্বী হ্যাঁ, উনি সম্ভবত কোটিতে এক। উনি মহামান্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। পত্রিকায় প্রকাশ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান সত্তর ছুঁই ছুঁই বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানও নাকি স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এই হেরোইন পাচারকারী এলিয়েদার মুক্তির ব্যাপারে উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য এই প্রসঙ্গে অন্য একটি ভাষ্যও শোনা যায়। বিচারপতি সাহেব নাকি এককালে কাব্য জলাশয়ে লম্ফ ঝম্প মারার চেষ্টাও করেছেন। সেই পুরানো অভ্যাসই হয়তো তাকে বর্তমান চুনোপুটিদের সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। যাকগে, যে কথা বলছিলাম আপিল বিভাগও যখন এলিয়েদার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ বহাল রাখার নির্দেশ দিলেন, তখন বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জনগণ সুপ্রিম কোর্টের সম্মানীত বিচারকগণের উদ্দেশ্যে মুষ্টিবদ্ধ ঘুষি পাকিয়ে সুদূর আমেরিকা থেকে ছুটে এলেন মার্কিন কংগ্রেসম্যান। তার ঘুষির ওয়েট আন্দাজ করে প্রধানমন্ত্রী ও প্রেসিডেন্টের অবস্থা নাস্তা-নাবুদ। ঘোষিত হলো এলিয়েদার মুক্তি। বাংলাদেশের আইন-কানুন, কোট-কাচারী, জজ সাহেব, বিচারপতি মহোদয়গণকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে রিচার্ডসন সত্যি মুক্ত করে নিলেন এলিয়েদাকে। যে পুলিশ প্রশাসন শুধু একা পথ চলার দোষে দিনাজপুরের গরীব অসহায় ষোড়শী ইয়াসমীনকে বলপূর্বক ধর্ষণে হত্যা করে নষ্টা, চরিত্রহীনা বলে অপবাদ দেয়, সেই পুলিশ কোটি টাকার হোরোইন পাচারকারী শাস্তিপ্রাপ্ত আসামীকে নিরাপত্তা যোগে সসম্মানে নিয়ে যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায়। সম্মানীত

www.pathagar.com

পাঠক, বাংলাদেশের জনগণের সাথে শোষক বুর্জোয়া, আমলা মুৎসুদ্দি সামন্ত প্রভু ও তাদের দালালদের রঙ্গব্যাঙ্গের খতিয়ান দীর্ঘ, আরো দীর্ঘ। আমি আজ আর ওদিকে যাবো না।

মার্কিন কংগ্রেসম্যান রিচার্ডসন এলিয়েদার মুক্তির মিশন শেষে ঢাকা ছাড়ার আগে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বলেছেন- এলিয়েদাকে মুক্তি দিয়ে বাংলাদেশ সরকার খুবই মানবিক কাজ করেছে। তিনি বলেননি তার দেশে প্রগতিশীল লেখক সাংবাদিক কালো মানুষের দরদী বন্ধু মুমিয়া আবু জামালকে মিথ্যে মামলার আসামী করে প্রায় ১৪ বছর যাবৎ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নির্যাতন চালিয়ে গণতন্ত্র মানবাধিকারের ধ্বজাধারী মার্কিন প্রশাসন কিসের কাজ করছেন? মার্কসবাদী লেনিনবাদী মাওবাদী নেতা পেরুর গণযুদ্ধের মহান নায়ক কমরেড গঞ্জালোকে গ্রেফতার এবং তার বিরুদ্ধে প্রসহসনমূলক বিচারে ফুজোমুরিকে সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে মার্কিন ফ্যাসিস্ট সরকারের অমানবিক কর্মটির কথাও তিনি বেমালুম চেপে গেছেন। হুতু তুতসী সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সংঘাত ও সোমালিয়ায় গৃহযুদ্ধ বাঁধিয়ে মনুষ্য রক্তের হোলি খেলা, ইরান-ইরাক, লিবিয়া-কিউবার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক রীতি বহির্ভূত অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ, সাম্প্রতিক সোমালিয়ার সমর নায়ক ফারাহ আইদীদের হত্যাকাণ্ড এসবই কি যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক কর্ম? না, মিষ্টার রিচার্ডসন ওসব কিছুই বল্লেন না। আমরা শুনলাম, শুনলাম মানবাধিকার হরণকারী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান রিচার্ডসনের মুখে বাংলাদেশের মানবিকতার উচ্চকীত প্রশংসা। শুনে খুশি হওয়ারই কথা। কিন্তু স্বনামধন্য আইনজ্ঞ, সম্মানীত বিচারপতি ও প্রেমপ্রাণ ইয়ং বন্ধুদের কষ্টের কথা ভেবে খুশি হতে পারিনি। আমার রিয়েলিস্টিক বন্ধুর ভাষায় নপুংসক বা হিজড়া যাই হোক না কেন আফটার অল তারা আমার দেশের। আর দেশি বলেই তাদের অতৃপ্ত আত্মা সহজেই আমাকে ব্যথা ভারাক্রান্ত করে তোলে। তাইতো এলিয়েদা প্রসঙ্গ এলেই বেদনা বিধুর মনে তাদের হয়ে বলে উঠি- "আমার বধূঁয়া আন বাড়ি যায় আমারই আঙ্গিনা দিয়া, তারে বাঁধিবো কি দিয়া?"

www.pathagar.com

কী চমৎকার দেখা গেলো

গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্র কাঠামোয় বাঁধা হত- দরিদ্র মানুষের ওপর জেঁকে বসেছে পিঠাপিঠি পাঁচটি মাস বিশাল বিশাল পাঁচ পাঁচটি জাতীয়, ধর্মীয় আচার উৎসব। ডিসেম্বর মাসে বিজয়ের আনন্দ উৎসব, জানুয়ারি মাসব্যাপি রমজান; রমজান শেষে ঈদুল ফিত্‌র তথা ঈদ উৎসব। ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবস, মার্চে স্বাধীনতা দিবস, এপ্রিলে ঈদুল আযহা সাথে বাংলা নববর্ষ উৎসব। ওপরোক্ত মাসগুলোতে উৎসব আনন্দের গুরুত্বে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, পবিত্র শব-এ-বরাত, ইংরেজি নববর্ষ, লায়লাতুল কদর এবং ১৭ই মার্চ জন্মোৎসবকেও খুব খাটো করে দেখার জো নেই। খাটো করে দেখছেও না কেউ। যুগ যুগ ব্যাপি পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস, ধর্মীয় সংস্কার-বিশ্বাস, রাষ্ট্র কর্তৃক মগজ ধোলাই এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক প্রচার প্রভাবের বদৌলতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম্য-শহুরে, ধনী-গরীব, যুব-বৃদ্ধ কম বেশি সকলেই বুঝে, না বুঝে উৎসব-বায়োস্কোপ বাক্সের ছিদ্রে চোখ লেপটে রেখে শুনে যাচ্ছি- কী চমৎকার দেখা গেলো!

লায়লাতুল বরাত অর্থাৎ নিস্কৃতির রাত বা ভাগ্য রজনীতে ভাগ্যবান প্রেসিডেন্ট, ভাগ্যবতী প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রীর আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া, দেশবাসীর মঙ্গল কামনার পবিত্র বাণী। বেতার টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা, মসজিদে মসজিদে কোরানখানি ও আলোচনা সভা।

কী চমৎকার দেখা গেলো- প্রত্যুষে সেনানীবাসে ৩১ বার তোপধ্বনি। প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দের সাভার স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ এবং আমলাদের উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্টকে গার্ড অব অনার প্রদানের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী, বিমান বাহিনী, বি ডি আর, পুলিশ, গ্রাম প্রতিরক্ষা দল ও ন্যাশনাল কোরের বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ। বিজয় দিবস,

www.pathagar.com

স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ মেলা, সভা-সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বঙ্গ ভবনে জমকালো সম্বর্ধনা। বেতার, টেলিভিশনে ক্ষমতাসীন দলের আত্মপ্রচার; নৃত্য-গান-নাটক। পত্র-পত্রিকায় রঙিন ক্রোড়পত্র, জাতির উদ্দেশ্যে নেতৃবৃন্দের বাণী, লাল নীল সবুজ বিজলী বাতির চমক।

কী চমৎকার দেখা গেলো - রমজান উপলক্ষে বিভিন্ন দেশের সরকার রাষ্ট্র প্রধানরা আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন। রোজা রমজানের পবিত্রতা রক্ষার ইচ্ছায় আগেভাগে রাজকীয় পিকনিক পার্টি করার ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে গালাগাল ও অপবাদের সম্মুখীন হন, তা পুষিয়ে নেবার জন্য পিকনিক পার্টির খেসারতে ইফতার পার্টি বর্জনের লোক দেখানো সিদ্ধান্ত।

কী চমৎকার দেখা গেলো- শেখ হাসিনার জাতবোন বেগম খালেদা জিয়ার কোটি কোটি টাকার ইফতার মাহফিল। ইফতার মাহফিল এরশাদ গোলাম আজমদের। দুর্নীতিবাজ চোরাকারবারীদের টাকায় ইফতার পোদ্দারি আমলা ডিসির। রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অর্থে ইফতার পোদ্দারি রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দীনের।

কী চমৎকার দেখা গেলো- গুলশান বারিধারা বনানী ধানমন্ডিবাসীদের জন্য চকবাজার মোগলটুলীর ঐতিহ্যবাহী মোঘলীয় ইফতারের সাথে ফাইভষ্টার, থ্রীষ্টার হোটেল রেস্তোরার গরম গরম ইউরোপিয়ান ফাষ্ট ফুড। ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহায় ঈদের স্বচ্ছ চিকন অর্ধচন্দ্র ব্লাউজে প্রদর্শনযোগ্য স্ফীত পুষ্ট বক্ষের সুন্দরী ললনাদের কেনা কাটায় মুখরিত ইফতার মার্কেট, অভিজাত বিপনী কেন্দ্র। দোকানে দোকানে বিজলী বাতিতে ঝলমল থ্রীপিস্-ফোর পিস, লেহাঙ্গা, পাঞ্জাবী, প্রিন্সেস ডায়না ড্রেস এবং সোনা রূপোর জরি করা শাড়ী সালোয়ার-কামিজ।

কী চমৎকার দেখা গেলো - ঈদ উপলক্ষ্যে ফ্যাশন সচেতন আধুনিকাদের ভীড়ে গমগমা বিউটি পার্লার। আই শ্যাডো, আই লাইনার, ব্লাশ অন, লিপ গ্লস মাস্কারার ষ্টক শেষ। ষ্টক শেষ দোকানীদের কোর্মা-পোলাও, জর্দা-পুডিং, সেমাই-আইসক্রীম, ঝাল টক চটপটির উপকরণাদি।

কী চমৎকার দেখা গেলো - জাকাতের কাপড় সংগ্রহের ভিড়ে ধূপরাজ বেগমদের দলিত মথিত লাশের রঙিন ছবি। ছবি, বাজারের সেরা গরু ছাগলের সাথে সেরা ক্রেতার তথা সেরা---।

www.pathagar.com

কী চমৎকার দেখা গেলো- ঈদের জামাত, প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রীর সরকারী বাস ভবনে দেশি বিদেশি মেহমানদের কোলাকুলি। জাতির উদ্দেশ্যে বাণী, পত্র পত্রিকায় ক্রোড়পত্র, বেতার টেলিভিশনে বিশেষ অনুষ্ঠান। রাতে আলোক সজ্জা, আরবী হরফ এর ব্যানার ফেষ্টুন পতাকা।

কী চমৎকার দেখা গেলো- দেয়ালে রাস্তায় ফুটপাথে গাছে গাছে অ আ ক খ বাংলা অক্ষর। বাংলা একাডেমীতে প্রধানমন্ত্রীর আগমনকে স্বাগত জানানোর ও প্রতিহত করার মিছিল সমাবেশ। ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠানমালা সারামাস। প্রতিক্রিয়াশীলদের ব্যবস্থাপনায় বাংলা একাডেমী, শিল্পকলা একাডেমী, যাদুঘর এবং শহীদ মিনারে সকাল সন্ধ্যা বাঙ্গালী সঙদের ভাবগম্ভীর গান-নৃত্য-নাটক। সবশেষে মিনার পাদদেশে নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলি পায়ের জুতায় দুমড়ানো মুচড়ানো হয়ে উৎসব পর্যবসিত ত্রাস উৎসবে।

কী চমৎকার দেখা গেলো- ভাষা শহীদদের শোক গাঁথা ফেব্রুয়ারির ২১ এর পিঠাপিঠি ২৩, ২৪, ও ২৫ তারিখ শহীদ মিনার থেকে অনূর্ধ্ব কোয়াটার ফার্লং দূরে উইন্টার গার্ডেনে 'ভোলে ভোলে লাড়কি খোল তেরী দিলকি' গানের তালে বোম্বের চিত্র নায়িকা মমতা কুলকার্নি এক পর্যায়ে তার শরীরের শ্লিভলেস লাল টপস খুলে ছুড়ে দিলেন। চমৎকার ইংরেজি নববর্ষের ঢোল ঢক্কর নৃত্য উন্মাদনা, মধ্যরাতে প্রকাশ্যে যুবতী কিশোরীদের আপেল সাদৃশ্য গালে চুম্বন, রমনায় শহুরে সাহেব বিবিদের পিয়াজ মরিচপোড়া পান্তাভাতের বাংলা নববর্ষ, প্রধানমন্ত্রীর মৃত পিতার জন্মোৎসব।

সত্যি চমৎকার! বাংলাদেশের ১৩ কোটি মানুষের মধ্যে ১২ কোটি মানুষই এক ভয়ংকর দুর্বিসহ পরিস্থিতির মধ্যে আজ দাঁড়িয়ে। ৯০ শতাংশ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা দারিদ্র সীমারও নীচে। অনাহার অর্ধাহারে রোগে শোকে মুহ্যমান এই জনগোষ্ঠী ভয়ানক এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি, বলা যায় মৃতপ্রায়। সেই মৃতপ্রায় মানুষের দেশে উৎসবের কী ছড়াছড়ি! এই দানবীয় উৎসব আনন্দের সাথে আদৌ কি কোন সম্পর্ক আছে এদেশের নব্বই ভাগ মানুষের? এ বিষয়ে গত ২/২/৯৮ তারিখে প্রকাশিত দৈনিক ইনকিলাবে যশোহর থেকে পাঠানো একটি রিপোর্ট- "অভাবের তীব্রতায় যশোহর অঞ্চলের সিংহভাগ খেটে খাওয়া দিন-মজুর, কৃষক ও ছিন্নমূলসহ সাধারণ লোকজনের পরিবারে ঈদের আনন্দ ম্লান হয়ে পড়ে। চাল ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি, দিন এনে দিন খাওয়া লোকের কাজের অভাব, কৃষককুল পরপর কয়েকটি ফসলে মার খাওয়ায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে

www.pathagar.com

চরম মন্দাভাবের কারণে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঈদের দিন বিভিন্ন স্থানে খোঁজ-খবর নিয়ে দিন-মজুর, কৃষক ও সাধারণ মানুষের দৈন্যদশার করুন চিত্র পাওয়া গেছে। মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদের আনন্দ যেন সর্বময় হয়ে ওঠেনি। ঈদের দিন যশোহর শহরের রেলগেট, উপ শহর, নীলগঞ্জ, পুরাতন কসবার কয়েকটি বস্তিতে বেশ কয়েকজন খেটে খাওয়া মানুষের সাথে কথা হল- তারা বলল, আমাদের ঘরে ঈদের আনন্দ লাগে নি; কি করব কাজ পাইনি, হাতে পয়সা নেই, ছেলে-পেলের নতুন জামা-কাপড় দিতে পারিনি। চাল কিনছি ১৬/১৭ টাকায়, সরকার চাল দিচ্ছে সাড়ে ১২ টাকায় তা আমাগের ভাগ্যে জুটছে না। শহরতলীর ক'জন কৃষকের কথা 'কষ্ট করে ফসল ফলিয়ে দাম পাইনি, নানা কারণে ফসল নষ্ট হয়েছে, আমরা মাঠে মারা গেছি, ঈদের খুশি আমাদের কপালে জুটেনি'। বেশ কয়েকজন সাধারণ ব্যবসায়ীর বক্তব্য, ঈদের আনন্দ স্পর্শ করেনি এবার। বেঁচা-কেনা হয়নি। জমানো টাকা ভেঙ্গে খেয়েছি, পয়সার অভাবে ঈদের কেনাকাটা করতে পারিনি।"

এবার কুড়িগ্রাম থেকে পাঠানো দৈনিক ইত্তেফাকে গত ৩/২/৯৮ তারিখে প্রকাশিত অন্যরকম একটি খন্ড রিপোর্ট- "উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ১২ হাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুদ ব্যবসায়ীদের কবলে পড়িয়া এইবার ঈদ করিতে পারে নাই। এই সকল শিক্ষক তাহাদের বেতন ও ভাতা উঠাইবার চেক বই আগাম সুদ ব্যবসায়ীদের নিকট জমা রাখিয়া সুদের উপর টাকা গ্রহণ করায় ঈদের সময় তাহাদের বেতন ও ভাতার টাকা তুলিতে পারে নাই। ফলে তাহারা ঈদের খুশীর দিনে স্ত্রী-পুত্র পরিজন লইয়া বিষাদপূর্ণ অবস্থায় সময় কাটাইয়াছে। খোঁজ লইয়া জানা গিয়াছে, এই সকল শিক্ষক বেতনের টাকায় সংসার চালাইতে না পারিয়া চড়াসুদে টাকা লইয়া সুদ ব্যবসায়ীদের হাতে স্বাক্ষরকৃত চেক-এর পাতা তুলিয়া দেয়। ঈদের চেকের পাতা ফেরৎ না পাওয়ায় তাহারা টাকা তুলিতে পারে নাই।"

এমনই হাজার হাজার হৃদয় বিদারক ঘটনার ঘনঘটার মাঝে উৎসব আনন্দের চমৎকার আসা যাওয়া। এ উৎসবের সাথে জানি না কি সম্পর্ক-গ্রাম বাংলার কোটি কোটি দরিদ্র পরিবার আর প্রান্তিক চাষীর; যারা টাউট-বাটপার জোতদার মহাজনের শোষণে অত্যাচারে নিঃস্ব হতে নিঃস্বতর হয়ে জমিজমা ঘরবাড়ি থেকে নিত্য বিতাড়িত। বন্যা খরা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অর্থনৈতিক শোষণের কারণে ব্যাংক থেকে গৃহিত-যৎসামান্য ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে রাষ্ট্রের গ্রেফতারী পরোয়ানা মাথায় নিয়ে ঋণগ্রস্ত যে কৃষকরা ভিটামাটি

www.pathagar.com

হালের গরু বিক্রি করে নিরুদ্দেশ হচ্ছে; জানি না তাদের কাছে কী তাৎপর্য বহন করে এই বিজয়-উৎসব এই স্বাধীনতা দিবস?

শতছেঁড়া তালিযুক্ত কাঁথা বা দুতিন ভাঁজ শাড়ী পেঁচিয়ে তীব্র কনকনে শীত নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করেন বিত্তহীন দরিদ্র অভাবী যে জনগোষ্ঠী, সেই জনগোষ্ঠীর সাথে এই ঈদ বাজারের সম্পর্কইবা কতটা? রেলস্টেশন, লঞ্চ-বাস টার্মিনাল, ফুটপাথ, অফিস বাড়ির বারান্দায় আর খোলা আকাশের নীচে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বারো মাস দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফটায় যে জীবন, সেই জীবনের সাথে বৈশাখ-জানুয়ারি, শাবান-শাওয়ালের আগমন নির্গমনের যোগাযোগইবা কোথায়?

আরবী ফার্সী ইংরেজি তো দূরের কথা ৭৮ শতাংশ মানুষের কাছে অ আ ক খও অবোধ্য চিহ্ন, সেখানে ঈদ স্বাধীনতা দিবস ও শহীদ দিবসের সচিত্র ফ্যাশন বিবরণ, চকমকে ক্রোড়পত্র বের হলেই কি আর না হলেই কি? হকার, বস্তিবাসী, রিক্সা- টেম্পো- বেবি চালক, গার্মেন্টিস কারখানার শ্রমিক, যারা অহর্নিস পরিশ্রমের পরেও অনাহার অর্ধাহারে দুঃখ কষ্টে দিনাতিপাত করছে; তাদের কাছে কি মূল্য আছে এসব উৎসব আনন্দের?

যে দেশের লক্ষ লক্ষ যুবতী নারী, পুলিশ-সীমান্ত রক্ষীর নাকের ডগায় পাচার হয়ে ভারত পাকিস্তানের পতিতালয়গুলোতে নরপশুদের কামনার আগুনে জ্বলে পুড়ে ছটফট করছে। যে দেশের অবোধ শিশুরা গিনিপিক হিসেবে পাচার হয়ে বেহেস্তি মরুর উঠের পীঠে চীৎকার করে মরছে; সে দেশ, সে রাষ্ট্রের এই স্বজাত্য ঐতিহ্য উৎসব, এই পবিত্র মরু সংস্কৃতির মহোৎসব চর্চা কিসের এবং কেন? যে ছিন্নমূল কিশোরী যুবতীরা জঠরের জ্বালায় বাধ্য হচ্ছে দেহ বিক্রি করতে; সেই অপবিত্র দেহের ছায়া জানিনা লাগে কিনা শব-এ-বরাত, শব-এ-কদর ও রমজানের রাতে বেহেস্ত থেকে নেমে আসা ফেরেস্তাদের পবিত্র গায়ে!

যে সমাজে নারীর রূপ, নারীর দেহকে পণ্য বানিয়ে মুনাফাখোররা সম্পদের পাহাড় গড়ে; আবার সেই সম্পদের জাকাত ফিত্‌রা বিলিয়ে আল্লাহ্‌র নামে ধর্মীয় উৎসব পালন করে; যে রাষ্ট্রে ন্যায্য দাবি দাওয়ার আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসে ক্ষতবিক্ষত লাশ হয়ে কৃষক শ্রমিক পচে গলে মরে, যে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন অসহায় যুবতী কিশোরীদের নিরাপত্তার নামে গণ ধর্ষণে হত্যা গুম করে; সে রাষ্ট্রের সে সমাজের এসব আচার উৎসব কিছুতেই শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষের উৎসব হতে পারে না।

www.pathagar.com

দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লোকের বাস গ্রামে। বিশ্বাস সংস্কার অভ্যাসের বশবর্তী হয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ ধর্ম তথা ঈশ্বর-ভীতির কারণে আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে রোজা নামাজটুকু পড়েন। ধর্মের বাড়াবাড়ি বাহ্য উৎসব অনুষ্ঠানাদিতে নয়; তারা তাদের আটপৌঢ়ে জীবনের মত দীনহীন ভাবে ধর্মানুশীলনে অভ্যস্থ এবং আন্তরিক। আদৌ উৎসাহ আগ্রহ নেই জাতীয় রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান উৎসবাদিতে। তাহলে আরবী-ফার্সী, ইংরেজি-বাংলা মাসের তারিখে তারিখে শব-এ-বরাত, রমজান, ঈদ, বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এত আলোকসজ্জা, বাহারী খানাপিনা, শান-শওকত, নৃত্য সংগীতে এত অর্থ ব্যয়, পতাকা ফুলের এত ছড়াছড়ির অর্থ কি? এসব কাদের জন্য?

এসব ভোগবাদী মুষ্ঠিমেয় মানুষের। যারা দেশের সহজ সরল সখ্যাগরিষ্ঠ কৃষক শ্রমিক মেহনতী মানুষের শ্রম ও সম্পদ শোষণ-আত্মসাৎ করে বিপুল অর্থ বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়েছেন; তারাই এসব উৎসব অনুষ্ঠানের হোতা। এই উৎসব অনুষ্ঠানকে তারা ব্যবহার করেন নিজেদের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণকে বিভিন্ন প্রকারে শোষণ নির্যাতনের মাধ্যমে গ্রামের অর্থ সম্পদ চুরি ডাকাতি করে এরা গড়ে তুলেছেন বিলাস বহুল আধুনিক শহর। সকল শান শওকত কেন্দ্রীভূত করেছে এই শহরে। নিজেদের খাদ্য বস্ত্র চিকিৎসা শিক্ষা সহ ভোগ বিলাসিতার নানা উপকরণে সমৃদ্ধ এই শহর নামক কেল্লাকে ঘিরেই যত আচার উৎসবের আড়ম্বর। এই শোষক শাসকরা তাদের ভোগ বিলাসের উৎসব এবং ক্ষমতার দাম্ভিকতা প্রকাশের জন্য নির্ধারণ করেছেন সৌর চন্দ্র ফসলী মাসের কতগুলো দিন তারিখ। ঈশ্বর তথা ধর্মকে শিখন্ডী বানিয়ে আরবীয় মরু সংস্কৃতি চর্চার জন্য তাদের প্রিয় চন্দ্র মাসের কিছু দিন তারিখ। সামন্ত জমিদারদের নববর্ষের পূণ্যাহ উৎসবের উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। রক্ত ঘামে উৎপাদিত ফসল ছলে বলে কৌশলে ভোগ করার সেই সামন্তীয় ঐতিহ্যকে পালন করছে এরা ফসলী মাসে। সৌরবর্ষের দিন তারিখে তারা একদিকে করেন পাশ্চাত্য আগ্রাসী সংস্কৃতির নগ্নতার জয়গান অন্যদিকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য সহযোগিতায় শাসন ক্ষমতা পাওয়ার অভিষেক স্মরণানুষ্ঠান। এসব আচার উৎসবের উপরি কাঠামোয় একটা সার্বজনিন জাতীয় চরিত্র দেয়ার প্রচেষ্টা শাসক শোষকদের সুদূর প্রসারী কূটকৌশল ছাড়া কিছু নয়।

এ বিষয়ে গবেষণার জন্য প্রগতিশীল বিজ্ঞান মনস্ক, ইতিহাসবিদ এবং মুক্তমনা সমাজ গবেষকদের এগিয়ে আসা প্রয়োজন। প্রয়োজন ধর্মীয় মানবতার গালগপ্পো ইবাদত-বরকত-রহমত, মাগফিরাত-আসমানী পয়গাম ইত্যাদির খোলস ভেদ করে প্রকৃত

www.pathagar.com

তথ্য ও সত্যকে বের করে আনা। ধরা যাক ঈদ। ঈদ আজ আর কেবল ধর্মীয় উৎসব নয়। এই উৎসব অনুষ্ঠান আমাদের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনকে বিপুল ভাবে প্রভাবিত করছে। এই উৎসব আনন্দের মধ্যে আমরা আমাদের দেশে এক আদিম উন্মত্ততাকে প্রত্যক্ষ করছি। যে উন্মত্ততা একসময় ছিল উৎসবকে কেন্দ্র করে প্রাচীন আরব ও পারস্যবাসীদের মধ্যে। প্রাচীন পারস্যবাসীরা তাদের লোকাচার 'নওরোয' 'মেহের' উৎসবকে কেন্দ্র করে বড় বড় সভায় মিলিত হয়ে আনন্দ উল্লাস করতো। বসতো জুয়ার আসর। মেতে ওঠতো হৈ হৈ ক্রীড়া কৌতুক মদ্যপানে। তারই অনুকরণে আরবীয় সংস্কৃতিতে 'এওমুন্নিরূয' এবং 'এওমুল-মেহেরজান' নামক দুটি উৎসবের প্রচলন ছিল। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মে মদ্যপান জুয়াখেলা নিষিদ্ধ হলেও বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান প্রবর্তনের পিছনে তৎকালীন আরবীয় ঐতিহ্যের প্রভাব অনুপ্রেরণা পুরোপুরিই ছিলো তা ইতিহাসই প্রমাণ করে। হযরত আনাস (রাঃ) এর বর্ণনা মতে, নবী করীম (সাঃ) যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে এলেন, তখন তিনি দেখলেন মদীনাবাসীরা বছরে দু'টি নির্দিষ্ট (উৎসব) দিনে খেলা-ধূলা ও আনন্দ উপভোগ করে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন যে ,এ দু'টি দিন কিসের? তারা বললেন, আমরা এই দুটি দিনে খেলা-তামাশা করতাম এবং আনন্দ উল্লাস করতাম। নবী করীম (সাঃ) বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা সেই দু'টি দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন তোমাদের জন্য দান করেছেন। একটি হলো ঈদুল ফিতরের দিন এবং অন্যটি ঈদুল আজহার দিন (আবু দাউদ)।' আরবীয়দের মধ্যে নরবলির অনুষ্ঠান ঐতিহ্য দীর্ঘকালের। ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে জানা যায় সেই বর্বরোচিত নরবলির প্রথাকে বিলুপ্ত করার জন্য পশুবলির প্রচলন করা হয়। এই দীর্ঘ চৌদ্দশ বছর পরও কি আমরা 'নরবলি' দেয়ার পাশবিক মানসিকতাকে অতিক্রম করতে পারি নি? তাহলে আজও কেন আমরা উট, গরু, খাসী, দুম্বা সাজিয়ে গুছিয়ে জবেহ করার উৎসব আনন্দ করে থাকি? মনোবিজ্ঞানী ও সমাজ-বিজ্ঞানীরা এ সমন্ধে যথাযথ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দিতে পারেন।

সত্যিকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের দাবি রাখে অন্যান্য জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস উৎসবগুলোও। কী ছিলো ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য? পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর সকল প্রকার অর্থনৈতিক শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে একুশের ভাষা আন্দোলন ছিলো পূর্ব বাংলার নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ, দুর্বার প্রতিরোধ। সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালু আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলো প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রাম। সামন্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিজাতি তত্ত্ব বিরোধী এই আন্দোলন সংগ্রামে যারা আত্মবলিদান করেছেন সেই বীর শহীদদের স্বপ্ন কি বাস্তবায়িত

www.pathagar.com

হয়েছে আজও? ২৫/২/৯৮ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক এর খবর- "বোম্বের চিত্র নায়িকা মমতা কুলকার্নি, গায়ক সুদেশ ভোসলে ও গায়িকা পূর্ণিমা গতকাল সন্ধ্যায় শেরাটনের উইন্টার গার্ডেনের দর্শকদের একটানা প্রায় ৪ ঘন্টা মনোরঞ্জন করিয়াছে। স্বল্প পোষাকে মমতার হিন্দী গানের সহিত উদ্বাহু নৃত্য দর্শকদের আনন্দে মাতোয়ারা করিয়া রাখে। কণ্ঠশিল্পী সুদেশ ভোসলে ও পূর্ণিমা নতুন-পুরাতন মিলাইয়া প্রায় ২০টি গান পরিবেশন করেন। ইহার অধিকাংশই ছিল হিন্দি ছবির গান। পূর্ণিমা একটি বাংলা ফোক গান গাহিয়া দর্শকদের আনন্দ দেন। সন্ধ্যা সোয়া সাতটায় ভারতীয় গায়ক গৌতম দে 'হাসিন রঙিন শাম- ' দিয়া অনুষ্ঠান শুরু করেন। উহার পর তিনি 'ইয়েস বস' ছবির 'ম্যায় কোই এ্যায়সা গীত গাও, কে আরজ জাগাও...' গাওয়ার পর মঞ্চে আসেন পূর্ণিমা। তিনি ইংরেজী ও বাংলা মিশেলে শুভ সন্ধ্যা জানাইয়া 'জ্বাল জ্বালা' ছবির 'শাম হ্যায় ধোয়া ধোয়া,-- গান দিয়া শুরু করেন। পূর্ণিমা নৃত্যতালে একে একে গাহিয়া চলেন 'আঠার বরস কুমারী কালিথি--. সোনা কিতনা সোনা হ্যায়--, বাংলা গান- 'আমার মনের মানুষ পেলাম না সই' 'ভারতপুর লুটগেয়ো হৈ মেরি আম্মা'--' তু তু তু তু তারা তোড়ো না দিল হামারা---, দেখজারা লাটকে-- ইত্যাদি। রাত ৮টা ১০ মিনিটে কমলা রংয়ের স্বল্প চোলি আর ঘাগরা পরিহিতা মমতা কুলকার্নি 'দিলবার' ছবির 'মুচকোরানা জি মাফ করনা' গানের তালে তালে মঞ্চে আসেন। 'দিলবার' ছবির সেই আলোচিত ঘাগরার চাইতে ইহা ছিল অনেক হ্রস্ব। তিনি হিন্দি ছবির কয়েকটি জনপ্রিয় গানের সহিত নৃত্য পরিবেশন করেন। মমতার পরপরই মঞ্চে আসেন সুদেশ ভোঁসলে। তিনি তাহার ভরাট মিষ্টি কণ্ঠে 'মুসাফির হে ইয়ারো--' যাঁহা তেরি নজর হায়-' মেহবুবা মেহবুবা--' 'ম্যায় দরদি রবরব--' 'মেরা জীবন কোরা কাগজ---','চুমা চুমা দেদে---' সহ পুরাতন নতুন মিলাইয়া ১০টির মত গান গাহিয়া আনন্দ দেন। রাত ৯টায় পুনরায় ৪ নৃত্য সঙ্গীর ঘাড়ে চড়িয়া মঞ্চে আসেন মমতা কুলকার্নি। "মাং মেরি ভরো কর, পেয়ার মুঝে কর--, ও 'ভোলেভালে লাড়কি খোলতেরী দিলকি' গানের তালে উদ্বাহু নৃত্যের এক পর্যায়ে মমতা তাহার শরীরের স্লিভলেস লাল টপস খুলিয়া ছুঁড়িয়া ফেলেন। পরনে থাকে কেবল দেহের উপরভাগে এক চিলতে আটোসাটো ব্লাউজ এবং নীচের অংশে স্কীন টাইট চামড়ার প্যান্ট। এই সময় তাহার সঙ্গী নৃত্য শিল্পীদের সহিত নৃত্যে উন্মাতাল করিয়া তোলে দর্শকদের। উহার পর মমতা একটি 'শের' পাঠ করিয়া শোনান। রাত ১১টা পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান। জানা যায়, গতকাল অনুষ্ঠানে অধিকাংশ ছিলেন আমন্ত্রিত অতিথি। সরকারী কর্মকর্তাদের সস্ত্রীক দেখা যায় অনুষ্ঠান উপভোগ করতে।" বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান স্বাস্থ্য শিক্ষার ন্যূনতম

www.pathagar.com

অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে ফেব্রুয়ারি মাস ব্যাপী চোখ জুড়ানো মনভোলানো উৎসব আনন্দের চাকচিক্যের যে অবক্ষয়ী চরিত্র আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তা প্রতিক্রিয়াশীল শাসক শোষক গোষ্ঠীর গণ বিরোধী চরিত্র নয় কি?

শাসক শোষক গোষ্ঠী উল্লেখিত উৎসব অনুষ্ঠানগুলোকে জাতীয় রাষ্ট্রীয় আন্তর্জাতিক ও ঈশ্বরীয় বলে প্রচার প্রোপাগান্ডার মাধ্যমে এমন এক ধূম্রজাল ছড়ান যাতে সহজেই ঢাকা পড়ে যায় এই রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপরিচালকদের শ্রেণী চরিত্রের নৃশংসতা। শ্রেণী ভিত্তিক রাষ্ট্রযন্ত্র, জনগণের স্বার্থ বিরোধী সরকার ও তার প্রচার মাধ্যমের ষড়যন্ত্রে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ আজ যুক্তি ও বাস্তবতার পরিবর্তে আবেগ তাড়িত হয়ে অনেক কষ্ট-অসামর্থতার মধ্যেও মেনে নিচ্ছে ঈদ বা তথাকথিত খুশির উৎসবকে, অজান্তেই জড়িয়ে পড়ছে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস শাসক শোষকদের ক্ষমতা দখলের বিজয় উৎসবে এবং তথাকথিত স্বাধীনতা দিবসের মতো অনেক সামাজিক ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে। এসব আচার অনুষ্ঠান উৎসবের চক্করে পড়ে যথেষ্ট খেসারত দিয়ে যাচ্ছেন তারা। খেসারত দিতে হচ্ছে জাতিকে। নিঃস্ব থেকে নিঃস্বতর হচ্ছে সাধারণ মানুষ। মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত স্বল্প আয়ের মানুষের পকেট ফতুর করতে জুড়ি নেই উৎসবের।

ঈদ এলেই দেখা যায় দূর অদূর পাল্লার বাস লঞ্চ ও অন্যান্য যানবাহনের ভাড়া বাড়ে তিন চার গুণ; কখনো তারও বেশি। জামা কাপড় জুতা ফিতা চাউল ডাউল তেল মসল্লা ছাড়াও প্রসাধন সামগ্রীর বেঁচা বিক্রি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাড়িয়ে দেয়া হয় এসবের মূল্য। উৎসব ছুটির সময় আত্মিয় পরিজনের কাছে যাওয়ার প্রয়োজনে, নিকট আত্মিয়দের নতুন জামা কাপড় দেয়ার লোকাচার রক্ষায় এই বাড়তি টাকাটা খসে যাচ্ছে মধ্যবিত্ত নিম্ন আয়ের মানুষের পকেট থেকে। এই টাকা পাচ্ছে কারা? যারা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার লঞ্চ বাস পরিবহনের মালিক তারা। প্রসাধন সামগ্রী আর জামা কাপড় জুতা ফিতার মিল ফ্যাক্টরীর মালিকদেরকেও আমরা চিনি। এসব লঞ্চ বাস মিল কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক কর্মচারীদের জীবনও কারো অজানা নয়। বাস লঞ্চ মিল মালিকরা উৎসবকে কেন্দ্র করে এক দিকে যেমন সাধারণ মানুষের টাকা পয়সা লুটে নিচ্ছে; অন্যদিকে শ্রমিক কর্মচারীদের দিয়ে অতিরিক্ত খাটুনি খাটিয়ে মুনাফা বৃদ্ধির জন্য উৎসবকে কাজে লাগাচ্ছে। এই মালিক শ্রেণীর কাছে শ্রমিক কর্মচারীরা ন্যায্য পাওনা ও বোনাস দাবি করে পায় চাকুরীচ্যুতির নোটিশ। তারা শিকার হয় লে-অফ, সন্ত্রাস এবং পুলিশী হয়রানির। রমজান ঈদকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর জনগণের টাকা হরিলুট করেন ফটকাবাজ ব্যবসায়ী। চোরাচালানীরা হয়ে

www.pathagar.com

ওঠেন তৎপর। অবৈধ পণ্যের পসরায় বাজার হাট সয়লাব। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াও হালের বলদ দুধের গাভী হয় নির্মম পশু হত্যার শিকার। ধর্মীয় উৎসবকে কাজে লাগিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ীরা শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ পায়। বৃদ্ধি পায় ধর্মান্ধ মানুষের সংখ্যা। ধর্মোন্মাদনার মাধ্যমে ধর্মান্ধ ফ্যাসিষ্টরা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে উঠে পড়ে লাগেন। ব্যভিচারী দুর্নীতিবাজ বড় বড় আমলা, ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী, চোরাকারবারী, লুটেরা আমদানী রপ্তানী কারক, বিবেক বর্জিত জোতদার মহাজন, দেশের সম্পদ বিদেশে পাচারকারী কালো টাকার মালিক এম পি-মন্ত্রী মিনিষ্টাররা সদগা জাকাত দান খয়রাতের মাধ্যমে দেশের গরীব দুঃখী সাধারণ মানুষের মধ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তারে এ জাতীয় উৎসব অনুষ্ঠানকে ব্যবহার করে থাকেন। এই সব দুর্নীতিবাজদের দানে অর্থে সাজ সাজ রব পড়ে যায় এতিমখানা- মক্তব- মাদ্রাসা- ক্লাব · মসজিদগুলোয়। অর্থের বিনিময়ে অশিক্ষিত লোভী আলেম ওলামারা মাহফিলে মাহ'ফলে দোয়া খায়ের করে আল্লাহর ওয়াস্তে দানশীল এই সমাজপতিদের চৌদ্দগোষ্ঠীকে পৌঁছে দেন জান্নাতুল ফেরদৌস পর্যন্ত। আতর গোলাপজল আগর বাতির খুশবুর মতো ছড়িয়ে যায় তাদের নাম আর পাক পবিত্র চরিত্রের কথা। ঘাম ময়লার দুর্গন্ধযুক্ত শত ছিন্ন এক তফন এক পিরনের গরীব অচ্ছুৎ অভূক্ত জনগোষ্ঠী রয়ে যায় জাহান্নাম নামক এই দেশ এই সমাজে।

জাহান্নামের দুঃখ কষ্টে জনগণকে বন্দি রেখে নিজেদের লুটপাটের স্বাধীনতা এবং ভোগবিলাস ও জনগণকে শাসন করার ক্ষমতা বিজয়ের বিজয় উৎসব করেন সাহাবুদ্দীন-হাসিনা-খালেদা-এরশাদ -গোলাম আজম ও বড় বড় ব্যবসায়ী আমলারা। ভুলুণ্ঠিত হচ্ছে শোষণ মুক্তি ও জনগণের স্বাধীনতার জন্য আত্ম উৎসর্গিত লক্ষ লক্ষ বীর শহীদদের স্বপ্ন আশা। মিথ্যাচারিতায় ঢাকা পড়ছে গণ মানুষের শোষণ- মুক্তির প্রকৃত লড়াইয়ের ইতিহাস। হাসিনা খালেদা গোলাম আজমদের স্বাধীনতার ইতিহাস মানে ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। সেই ষড়যন্ত্র ছিলো এদেশের সাধারণ মানুষের শোষণমুক্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতা লড়াইকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র।

দীর্ঘ সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে এদেশের কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ যখন ষাট দশকের শেষ দিকে 'পূর্ব বাংলার আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার সহ কৃষকের হাতে জমি' এই আওয়াজের ভিত্তিতে স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা কায়েমের লক্ষ্যে সংগঠিত হচ্ছিলো, সকল শোষণ নিপীড়ন নির্যতনের বিরুদ্ধে মর্যাদাপূর্ণ লড়াইয়ে বিপ্লবী পার্টি পুনর্গঠন ও সশস্ত্র বিপ্লবী যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো; সেই লক্ষ্য সেই প্রস্তুতিকে বানচাল

www.pathagar.com

করার জন্য শুরু হয় বিভিন্ন কূট কৌশল, জনবিরোধী ষড়যন্ত্র। পাকিস্তানী শাসক শোষক গোষ্ঠীর সাথে তখন প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে হাত মিলায় পূর্ব বাংলার সামন্ত মুৎসুদ্দী পেটি বুর্জোয়া দল আওয়ামী লীগ। ফলশ্রুতিতে নির্বাচন-ক্ষমতা-প্রধান মন্ত্রীত্বের মূলা দেখিয়ে পাকিস্তানী শাসক চক্র পূর্ব বাংলায় স্বতঃস্ফূর্ত গড়ে ওঠা সংগ্রামকে সাময়িক হলেও ভিন্নখাতে নিয়ে যেতে সফল হয়। নির্বাচনে কালক্ষেপণ করে সশস্ত্র আক্রমণের দ্বারা সেই সংগ্রামকে সমূলে নষ্ট করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে তারা তাদের পশুশক্তি নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে এ দেশের শ্রমিক-কৃষক-বস্তিবাসী-ছাত্র-জনতা-বাঙ্গালী পুলিশ-ইপি আর বাহিনী সহ সর্বস্তরের মানুষের ওপর ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ রাতের আঁধারে। এই হিংস্র পশুদের আক্রমণে গণহত্যার শিকার হয় লক্ষ লক্ষ মা বোন ভাই ছাত্র শিক্ষক। পূর্ব বাংলার সাধারণ মানুষের সেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবির সাথে ষড়যন্ত্রকারীদের নেতা কূল কিনারা না দেখে নতুন ষড়যন্ত্রের জন্য আত্মসমর্পণ করেন পাকিস্তানের সামরিক জান্তার কাছে। একই উদ্দেশ্যে জনগণকে অরক্ষিত অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি ফেলে রেখে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ পালিয়ে যায় পাশ্ববর্তী সম্প্রসারণবাদী রাষ্ট্র ভারতে। বর্বর হানাদার পাক বাহিনীর হিংস্র আক্রমণে বিপ্লবীরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হলেও বিভিন্ন জেলা আঞ্চলিক কমিটি স্ব স্ব উদ্যোগে জনগণকে সাথে নিয়ে পাক বাহিনীকে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং জাতীয় মুক্তিযুদ্ধকে সংগঠিত করার কাজে সর্বাত্মক শক্তি নিয়োগ করেন। ভাগ চাষী, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও গ্রামীণ যুবকদের নিয়ে পূর্ব বাংলার মাটিতেই গড়ে ওঠে গণ মুক্তিফৌজ, ঘাটি এলাকা। সাম্যবাদী বিপ্লবীদের নেতৃত্বে বিকশিত হতে থাকে বিপ্লবী কৃষক সংগ্রাম এবং জাতীয় মুক্তির মুক্তিযুদ্ধ। এই সংগ্রাম ও যুদ্ধের তৎপরতায় শংকিত হয়ে ওঠে পূর্ব বাংলার সামন্ত মুৎসুদ্দি, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। শুরু হয় পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাধীন সার্বভৌম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবী মতাদর্শিক জনযুদ্ধকে বানচালের আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। নিজ দেশের জনগণ ও বিপ্লবীদের রক্তে রঞ্জিত সম্প্রসারণবাদী ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের শর্তসাপেক্ষে আশ্রয়ে সংগঠিত হয়ে ওঠে পালিয়ে যাওয়া পূর্ব বাংলার প্রতিক্রিয়াশীল দলের ষড়যন্ত্রকারী নেতৃবৃন্দ। তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ রুশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে ফয়দা লুটার জন্য বাস্তবায়িত করতে নামে ভারতের নীল নকশা। ভারত ও আওয়ামী লীগ প্রভু ভৃত্যের চুক্তিতে পূর্ব বাংলার জনগণের মুক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্খাকে ব্যবহারের মাধ্যমে দেশমাতৃকাকে শত্রুমুক্ত করতে ঝাপিয়ে পড়া লক্ষ লক্ষ অসীম সাহসী ছাত্র যুবক কৃষকের আত্মদানের সাথে বেঈমানী করে ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে বাংলাদেশের ওপর

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠিত করে তাদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও আধিপত্য। মুখ থুবরে পড়ে দীর্ঘ সংগ্রামের বিকশিত নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধারা। জনগণের প্রকৃত মুক্তি ও সত্যিকার স্বাধীনতার আশা আকাঙ্খাকে তথাকথিত স্বাধীনতার তকমা পরিয়ে চোরাগুপ্তা রাস্তায় নিশ্চিহ্ন করে রুশ ভারতের দালাল শেখ মুজিবর রহমান।

তারপরের ইতিহাস সবারই জানা। তারই পদাঙ্ক অনুসরণের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদের সেবাদাস জেনারেল জিয়া, বিচারপতি সাত্তার, জেনারেল এরশাদ, জেনারেল জায়া বেগম খালেদা, জেনারেল পরিবৃত্ত শেখ হাসিনা একই ভাবে জনগণের আশা আকাঙ্খা দাবি দাওয়াকে পদদলিত করছে নির্যাতন নিপীড়নের মাধ্যমে। নির্বাচন, গণতন্ত্র, শাসনতন্ত্র, স্বাধীনতার নামে জনগণ প্রতিনিয়ত প্রতারিত হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের দালাল এই শাসক শোষক গোষ্ঠী কর্তৃক। শাসক শোষকদের স্বাধীনতা বিজয়, শাসিত শোষিতদের স্বাধীনতা বিজয় এক নয়। শাসকদের বিজয় বিদেশি শক্তির সহযোগিতায় জনগণের ওপর ক্ষমতা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার বিজয়। শোষকদের স্বাধীনতা জাতীয় সম্পদ লুটপাট করে বিদেশে পাচারের মাধ্যমে রাতারাতি কোটিপতি হবার স্বাধীনতা। এছাড়া হত্যা-ধর্ষণ-ভোগ বিলাসেও তাদের সীমাহীন স্বাধীনতা।

স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদের স্মরণে অনুষ্ঠান, শহীদ মিনার, স্মৃতি সৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ, নগ্ন পদযাত্রা, সংবিধান, গণতন্ত্র, স্বাধীনতার নামে গলাবাজি ইত্যাদি সবই তাদের লোক দেখানো এবং ভাওতাবাজি। নিজেদের লুটপাট ক্ষমতার স্বার্থেই ওরা ওসব করে থাকে। দেখতে হয় তাই দেখে, শুনতে হয় তাই শোনে; এছাড়া আর কোন উৎসাহ আগ্রহ নেই ওসব আচার অনুষ্ঠানাদির প্রতি এ দেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের। তবে ছিন্নমূল গরীব মানুষের একটি উৎসাহ আছে এইসব উৎসব অনুষ্ঠানের প্রতি। ছিন্নমূল গরীব মানুষ অপেক্ষায় থাকে কখন শেষ হবে অনুষ্ঠান। উৎসব অনুষ্ঠান শেষে তাদের ছুটোছুটি ব্যস্ততা ব্যানার ফেস্টুন দখলের। ব্যানার ফেস্টুনের কাপড় হয় তাদের মা বোনের লজ্জা নিবারণের বস্ত্র; লাঠি হয় বস্তির খুঁটি। পতাকা নয়; পতাকা অঙ্কিত কাগজ কাপড়ই তাদের প্রয়োজন। এখানে সেখানে কুড়িয়ে আনা ধূলোভরা চাউল ফুটাতে আগুন জ্বালে সেই কাগজে কাপড়ে। তারা বুঝে না, বুঝার কথাও নয় পতাকা সৌধ শহীদ মিনারের মহত্ত্ব মর্যাদা। তারা চায় শহীদ মিনারে অর্পিত কিছু পুষ্পস্তবক। নেতা নেত্রীর অর্পিত পুষ্পস্তবক দখলের ওপর নির্ভর করে কারো কারো দুপুর বা রাতের একবেলা খাওয়া। দু'একটা পুষ্প স্তবক ছো মেরে ছিনিয়ে নিতে পারলে সেটা বিক্রির পয়সায় জুটবে দু'চারদিন না খাওয়া

www.pathagar.com

জঠরে দুমুঠো ভাত। সত্যি কী চমৎকার আমাদের সমাজ! দেশ ও জাতির জন্য শহীদদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের সাথে তামাসা করতে জাতীয় নেতৃবৃন্দ শহীদ মিনার শহীদ বেদীতে যান; ফুল নয় ফুলের কলঙ্ক ছড়ান। আর বঞ্চিত নিরন্ন নিরক্ষর ছিন্নমূল মানুষ সেই তামাসার ফুল ছিনিয়ে নিয়ে নিজেদের অজান্তেই কলঙ্কমুক্ত করেন শহীদবেদীর। এ বিষয়ে ১৫ ডিসেম্বর '৯৭ দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত প্রতিবেদন- "শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে প্রধানমন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও বিভিন্ন নেতা কর্মীরা পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন। এই সময় বিউগলে করুন সুর বাজানো হয়। কয়েকটি বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে মাজারে পুষ্প স্তবক দেওয়ার সময় পরিবেশে ছিলো না কোন শোকের উপস্থিতি। প্রতি বছরের মত গতকালও মাজার এলাকা নিয়ন্ত্রণে ছিল না কোন সুষ্ঠু আয়োজন। ইহার ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পন করিয়া চলিয়া যাওয়ার পরপরই একদল টোকাই দৌড়াইয়া আসিয়া ফুল নেওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ আসিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। মাজারে যে ধরনের ভাবগম্ভির পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজন তাহা গতকাল করা হয় নাই। একজন এমপিকে দেখা গেল খালি হাতে মাজারের বেদীতে উঠিতে। মাজারে অর্পণ করা পুষ্পস্তবক তুলিয়া নিয়া তিনি ক্যামেরায় পোজ দিলেন। ইহার পর চলিয়া গেলেন। মাজারের উপর টোকাই ও ছিন্নমূল মানুষের অনাকাঙ্খিত ভিড় ঠেকানো যায় নাই। টোকাইরা ফুল নিয়া কাড়াকাড়ি করিয়াছে।"

অতএব এরপরও কি উৎসব বায়োস্কোপ বাক্সের ছিদ্রে চোখ লেপটে রেখে শুনতে হবে- কী চমৎকার দেখা গেলো? ❑

[তথ্য সূত্র:- বাংলাদেশের উদ্ভব এবং বর্তমান বাংলাদেশের পরিস্থিতি / অজয়দত্ত। ঈদ মোবারক / মুহম্মদ এনামুল হক। মাসিক আদর্শ নারী, ৪র্থ বর্ষ ২য় সংখ্যা এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা সমূহ।]

www.pathagar.com

প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্পের সংকট এবং সম্ভাবনা

সংকট! সংকট সর্বত্র সবখানে। বাংলাদেশ আজ সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সবদিক থেকে বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি। দেশের জনগণ চরম অসুখী। চাঁদাবাজ মাস্তানদের দৌরাত্ম্য দিনদিন বাড়ছে। দেশটা যেন জুলুমবাজদের দখলে। স্বৈরাচার সন্ত্রাসে ছেয়ে গেছে সারা দেশ। পথে ঘাটে চলাফেরায় নেই জীবনের নিরাপত্তা। যানবাহনে ইচ্ছে মাফিক ভাড়া বৃদ্ধি, দুর্নীতি ঘুষের আখড়া অফিস আদালতগুলো। অসাধু ব্যবসায়ীদের কালো টাকার তেলেসমাতি দিনকে করছে রাত, রাতকে দিন। গ্রামাঞ্চলে সাধারণ গরীব কৃষকরা মহাজন জোতদারদের দুর্নীতি নির্যাতনের শিকার হয়ে ভিটে-মাটি হারাচ্ছে। মিল কলকারখানায় মালিকের ভাড়াটে ট্রেড ইউনিয়নের যাতাকলে পিষ্ট শ্রমিক তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত। বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলসমূহের সরবরাহকৃত অস্ত্রে শিক্ষাঙ্গনগুলো একেকটা মিনি ক্যান্টনমেন্ট। একদিকে বেকার সমস্যা, অন্যদিকে গোল্ডেন হ্যাণ্ড শেকের নামে মধ্যবিত্ত চাকুরেদের পরিবার পরিজনকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে অনিশ্চিত জীবনের দিকে। গণবিরোধী, জাতীয় স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির শোষণ, নির্যাতন, চক্রান্ত ও মিথ্যা প্ররোচনার বেড়াজালে বাংলাদেশের জনগণ বন্দী। রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্রম অবক্ষয় প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সংস্কৃতিতে জন্ম দিচ্ছে এক সর্বগ্রাসী সংকট। রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের বেপরোয়া ব্যবহার জনজীবনকে করেছে আরোও বেশী সংকটাপন্ন। এরই হিংস্ররূপ নিয়ে সংস্কৃতি অঙ্গনে চলেছে অপসংস্কৃতির দৌরাত্ম্য। এই অপসংস্কৃতির মূল লক্ষ্য সাধারণ মানুষ যাতে তাদের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সংকটের বিরুদ্ধে ভাবাদর্শের সংগ্রামে সংগঠিত হতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে তাদের চিন্তা চেতনাকে স্তব্ধ করে দেয়া। কিন্তু সমাজে ব্যক্তি মানুষের অস্তিত্ব, অবস্থান, জীবনযাত্রা প্রাণালী যতই সংকটময় হয়ে ওঠছে, অপসংস্কৃতি ও গণ-সংস্কৃতির দ্বান্দ্বিক প্রশ্নটিও তত তীব্রতর হচ্ছে। সাহিত্য ও শিল্পের মূল সংকট চিহ্নিত করতে হলে আমাদের সামাজিক রাজনৈতিক

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সংকটকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন। এই সংকট ও নৈরাজ্যের মূলে রয়েছে সামাজিক উৎপাদন কিন্তু অসম বন্টন ব্যবস্থা। সাহিত্য শিল্প যারা সৃষ্টি করেন, সেই লেখক শিল্পীরা এই সমাজেরই বাসিন্দা। সে কারণে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সংকট সৃষ্টি হলে আমরা তার প্রতিফলন দেখতে পাই লেখক শিল্পী এবং অন্যান্য সংস্কৃতি কর্মীদের শিল্প কর্মে তথা সংস্কৃতির মধ্যে। প্রথমেই আলোচনা করা দরকার সংস্কৃতি বলতে আমরা কি বুঝি।

সাধারণ ভাষায় একটি সমাজের সদস্য হিসেবে সে সমাজের জনগোষ্ঠীর ভাষা, পোষাক-পরিচ্ছেদ, ধ্যান-ধারণা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদি যা মানুষ অর্জন করেন তাই তার সংস্কৃতি। মার্কসীয় পরিভাষায় সংস্কৃতি হলো সমাজের অধি-কাঠামো বা উপর কাঠামো। অবকাঠামোকে অবলম্বন করে গড়ে উঠে অধি-কাঠামো বা সংস্কৃতি। সমাজকে ভিত্তি করেই যেহেতু শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অতএব এটি একটি সামাজিক কর্ম। আর সমাজের উৎস হলো উৎপাদন প্রক্রিয়া।

মানুষ তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে শুরু করে ঐক্যবদ্ধ উৎপাদন। ঐক্যবদ্ধভাবে সামাজিক উৎপাদনে জড়িত হয়ে পরস্পর পরস্পরের সাথে যে সম্পর্কে জড়িত হয় তাকেই বলে উৎপাদন সম্পর্ক। এই উৎপাদনকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে সমাজ। আর এই সমাজবদ্ধ মানুষের চিন্তা চেতনার বিকাশ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে উদ্ভব হয় শোষক ও শোষিত শ্রেণীর। শুরু হয় শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ। এই শ্রেণী স্বার্থের সাথে সম্পর্কীত হয়ে মানুষের চিন্তা ভাবনা তার সাহিত্যে শিল্পে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সংক্ষেপে বলা যায় সংস্কৃতি হলো প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম তথা জীবিকা প্রয়াস এবং শ্রেণী সংগ্রামের কার্যকলাপ। সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম সাহিত্য, নাটক, সংগীতের মধ্যে মানুষ তার সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্খা এবং জীবন সংগ্রামের কথা বিচিত্রভাবে প্রকাশ করে থাকেন। মানুষের সামগ্রিক জীবনচিত্রই সংস্কৃতির অন্তর্ভূক্ত। সংস্কৃতি যেহেতু সমাজের বিষয় অর্থাৎ সামাজিক কর্ম, শ্রেণী বিভক্ত সমাজে যে শ্রেণী সমাজ ব্যবস্থায় তথা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রাধান্য বিস্তার করে, সেই শ্রেণী তার শ্রেণী স্বার্থে এই শিল্প সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে।

বাস্তব অবস্থা প্রমাণ করে বারবার পতাকা বদলের পরও এদেশের সাধারণ মানুষের জীবনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। একটার পর একটা সরকার এসেছে; কেউ ভোট ডাকাতি

www.pathagar.com

করে, কেউ বন্দুকের জোরে, কেউবা তথাকথিত নিরপেক্ষা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে কালো টাকার নির্বাচনে। এতে দুঃখী মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকেই গেছে, অর্থ সম্পদ বেড়েছে ধনী মানুষের। এই সব দুর্নীতিপরায়ণ ধনী লোকদের স্বার্থে প্রচার প্রসার লাভ করেছে এদেশের সংস্কৃতি। স্বভাবত:ই বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মঙ্গল বা কল্যাণের দিশা থাকতে পারে না এই সাহিত্যে, শিল্পে তথা সংস্কৃতিতে।

বুর্জোয়ারা নিজেদের স্বার্থে সুবিধাবাদী উচ্চবিলাসী বুদ্ধিজীবি তথা শিল্পী সাহিত্যিকদের দিয়ে তাদের মনগড়া নৈতিকতাহীন ধর্মীয় নীতিবোধ, কুসংস্কারপূর্ণ শিল্প সংস্কৃতির প্রচার করে থাকেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, রেডিও-টেলিভিশনসহ অন্যান্য প্রচার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে নামাজ-রোজা, পূঁজা-পার্বন, পাপ-পূণ্য, বেহেস্ত-দোজখ, ধর্ম, রাষ্ট্র এবং নিজেদের স্বার্থে তৈরী রীতিনীতি বছরের পর বছর যুগের পর যুগ মানুষের মধ্যে প্রচার করে সাধারণ মানুষের অভ্যাসে পরিণত করে; যা বংশ পরম্পরা মানুষ এই সব রীতিনীতি অভ্যাস তাদের সহজাত প্রবৃত্তি বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। আর তথাকথিত বুদ্ধিজীবিগণও এই সংস্কৃতিকে আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য বলে প্রপাগান্ডা করে বেড়ায়। যেহেতু এই সংস্কৃতি বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার একটি ষড়যন্ত্রের ফসল এবং এই বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থা টিকে থাকলে নিজেদের লাভ তাই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ওপরোক্ত বুদ্ধিজীবিদের অর্থ দিয়ে, বিভিন্ন পদক দিয়ে এর পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এই পন্থায় শোষক শ্রেণী মানব সমাজে শোষণ মূলক সাম্রজ্যবাদী আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। এরা জনগণকে অন্ধত্ব এবং কুসংস্কারে আবদ্ধ রাখার জন্য ধর্মীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কথা বলেন। সাহিত্যে ও শিল্পে ধর্ম তাই বারবার বিষয়বস্তু হয়ে আসছে।

স্বপ্ন বিলাসী ভাববাদী শিল্পী লেখকগণ প্রচলিত এই সমাজ সংস্কারকে টিকিয়ে রাখার মাধ্যমে জিইয়ে রাখতে চায় মানুষে মানুষে বৈষম্য। তাদের কাছে শ্রেণীগত স্বার্থটাই বড়। এরা প্রতিক্রিয়াশীল। প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প সাহিত্যের ধারক বাহক। এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রগতির পরিপন্থী, মানবতার শত্রু। তারা যে সংস্কৃতির ঐতিহ্যের কথা বলেন তাদের ভাষায় তা সনাতন ঐতিহ্য। ইতিহাস এবং সমাজ বিকাশ সম্পর্কে সামান্য ধারণা থাকলে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ভাষা, শাস্ত্র সবই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফল।

মানবতার সপক্ষে এবং ওসব স্থবির গণবিরোধী অন্ধত্ব নীতি শাস্ত্রের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে গেলে, কিছু লিখলে সে হয় তাদের ভাষায় অধার্মিক, নাস্তিক, মুরতাদ। ঐ সব

www.pathagar.com

কিছুই নাকি প্রথা প্রাকৃতিক। কিন্তু মানুষ কোন দিনই প্রকৃতির অধীনতা মানে নি। প্রকৃতিকে জয় করাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ চিরদিন তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই প্রকৃতিকে তার বশে এনেছে। উদ্ভাবন করেছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন উপকরণ, আবিষ্কার করেছে উন্নততর হাতিয়ার।

শিল্প সাহিত্য প্রয়াসও আবিস্কারের যাত্রা। শিল্পী এই গতিশীল সমাজ বিকাশের একনিষ্ঠ সাধক। শিল্পী এবং সাহিত্যিকগণ গতিশীল সমাজের বিস্তৃত জনগণ থেকে তার শিল্প উপাদান গ্রহন করবেন এবং সেই উপাদানই আবার জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন নিজের অভিজ্ঞতাকে সংযুক্ত করে। এই বিশ্ব জগতের সব রকম ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রনায় আবিষ্ঠ থেকেও তার অন্তর্দৃষ্টি সম্ভাবনাময় সুন্দর পৃথিবীর দিকে প্রসারিত।

দুঃখজনকভাবে বলতে হয় আমাদের সংস্কৃতির বিভিন্ন মাধ্যম-সিনেমা, যাত্রা, সঙ্গীত, নাটক, কবিতা সব কিছুই পশ্চাদপদতা, বিকৃতবোধ, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতার বিষক্রিয়ায় সংক্রামিত। এই মাধ্যমগুলো প্রতিক্রিয়াশীলরা তাদের স্বার্থে ব্যবহার করে যাচ্ছেন যথেচ্ছভাবে।

আমাদের চলচ্চিত্রের কথাই ধরা যাক। দেশে চলচ্চিত্র নির্মিত হচ্ছে শুধু মনোরঞ্জনের জন্য। সিনেমার শিল্পগত তাৎপর্যকে উপেক্ষা করে আজগুবি গল্পের ফাঁদ পেতে অসামঞ্জস্য পোষাক ও ম্যাকাপে বাস্তব বর্জিত চরিত্রকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। গল্পের পাত্র পাত্রীরা আমাদের সমাজ সংসারে অদেখা অচেনা চরিত্র। গাঁজার নৌকা পাহাড় ডিঙ্গানোর কাজে সিনেমার কলাকুশলীরা ভীষণ পারদর্শি। এছাড়া বিকৃত নৃত্যগীতে যুব সমাজের চরিত্র হননই যেন এই শিল্প মাধ্যমটির প্রধান কর্ম। দেশ, সমাজ, সমাজের মানুষ তাদের কাছে বড় নয়। এতে সমাজের যে কত বড় ক্ষতি হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই সিনেমায় পুজি বিনিয়োগকারীর বা সিনেমা নির্মাতার। ব্যবসায়ীক সাফল্য এবং মননশীল শিল্পকে ধ্বংস করে তাদের শ্রেণী চরিত্র রক্ষাই বড় কাজ।

সামগ্রিকভাবে দেশের চলচ্চিত্র আজ প্রগতিশীল সাহিত্য শিল্প বিবর্জিত। নকল, অশ্লীলতা, খুনোখুনি, রক্তপাত, মারদাঙ্গা ষ্টাইলের ছবি আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বেশী। বাস্তবে যে সব ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে, যা নিন্দনীয়, তাকে বিশ্বাসযোগ্য করে উপস্থাপনা করা হচ্ছে। কোন কোন ছবিতে বিভিন্ন কৌশলে নায়িকার সতিত্ব প্রমাণের জন্য অগ্নি পরীক্ষায় দাঁড় করিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে নৈতিকতা বলে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস চলছে। এই সব বিকৃত রুচির

www.pathagar.com

চলচ্চিত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে দুষ্টগ্রহ। সুস্থ চলচ্চিত্রের নামে যেসব ছবির পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়ে থাকে, সেসব অধিকাংশ ছবিতেও এদেশের সাধারণ মানুষের প্রকৃত জীবন চিত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু চলচ্চিত্র কেন সংস্কৃতির অন্যান্য মাধ্যম গুলোকেও গ্রাস করেছে অপসংস্কৃতির প্রেতাত্মা।

পুঁজিবাদী সমাজে যাবতীয় বস্তুর মত শিল্প সাহিত্যও পণ্য। সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য কলা নৈপুণ্যের কাজে গল্প, উপন্যাস ও কবিতাকে ঘষা মাজা করে সময় অপচয় করতে আমরা বেশীব্যস্ত। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ কবিতা শিল্পে থাকে স্রষ্টার নিজেকে নিয়ে চিন্তা, নারী ও প্রেম, নিঃসঙ্গতা। যৌনতাতো থাকবেই। তাদের দাবী, সময় ও সময়ের উপস্থিতিই শিল্প। তাদের চোখে সময় বলতে হতাশা, দীনতা এবং উৎশৃঙ্খলতা। সমাজের কদর্য, যৌনতা দখল করে রাখে কবির চিন্তা ও চেতনাকে।

১৬/১৭ বৎসর বয়সের তরুণ তরুণীদের কৌতুহল এবং মনস্তত্বকে পুঁজি করে তৈরী হচ্ছে বাজার কাটতি গল্প উপন্যাস। বাস্তবতা বর্জিত এইসব গল্প উপন্যাসে নেই আর্থ সামাজিক অবক্ষয়ের কথা, নেই লুণ্ঠন স্বেচ্ছাচারিতার চিত্র। অথচ মানুষের মূল সমস্যার গভীরেই প্রোথিত থাকে সাহিত্যের উপাদান। সমাজের মানুষের অস্তিত্ব, সংকট এবং জীবন সংগ্রাম স্বরূপের শিল্পময় উপস্থাপনাই একজন লেককের দায়।

নাটক বা থিয়েটার আমাদের সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বলিষ্ঠ মাধ্যম। এলিট ক্লাশ এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্তের অবসর বিনোদনের রসনাকে পরিতৃপ্ত করাই যেন ঢাকা বেইলী রোড কেন্দ্রিক নাটকের উদ্দেশ্য। নাটক দেখা এই শ্রেণীর আভিজাত্যের অঙ্গ। নাটক দেখে চিনা বাদামের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কপোাত-কপোতিরা পথ পরিক্রম করে। নাটক যদি দর্শক শ্রোতাকে বিব্রত করতে না পারলো, তাকে যদি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে দেয়া হলো, তবে এই নাটকে কী লাভ? বেশীর ভাগ নাটকে আমরা বিষয়বস্তু নিয়ে যত না ভাবি, তার আঙ্গিক বা ফর্ম নিয়ে আমাদের পাণ্ডিত্যকে জাহির করতে বেশী উৎসাহী। আমাদের নির্দিষ্ট করতে হবে নাটক কি শুধু বিনোদন? নাটক কি শুধু ফর্ম বা আঙ্গিকের শিল্প নিয়ে গবেষণা? সমাজের প্রতি যে শিল্পের কোন কমিটমেন্ট নেই, তা যত বড় শিল্পই হোক কালের বিচারে পরিত্যাজ্য। অবশ্য বাংলাদেশের বেশকিছু সচেতন নাট্যকর্মী সমাজ জীবন, ব্যক্তিজীবনের কথা অত্যন্ত সাহসীকতার সঙ্গে তুলে ধরছেন তাদের নাটকে। সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে উপস্থিত ব্যক্তি ও সমাজের বিবিধ সমস্যা নিয়ে গ্রামাঞ্চলে যে মুক্তনাটক এবং পথে পথে পথ-নাটকের উদ্দ্যোগ তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় শিল্পকর্ম।

www.pathagar.com

মজার কথা সংগীতের দৈন্যদশার কথা সংগীতজ্ঞরাই বলে বেড়ান। এই বলার পিছনে অন্যের কুৎসা রটিয়ে নিজের আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করার হীন মানসীকতা। বর্তমান সংগীতে জীবন বোধের বিশ্বাস একেবারে লুপ্ত। কি সুরে কি বাণীতে কোথাও কোন নিষ্ঠার ছাঁপ নেই। এসব গানে সুস্থ চিন্তা চেতনা অনুপস্থিত। নকলের প্রবণতা দিন দিন বাড়ছেই। পাশ্চাত্যের অনুকরণে ব্যান্ডের উচ্ছৃংখল তাণ্ডব, হাত পা ছোঁড়াছুড়ি, সমকালীন সংগীতের বিকৃতি করণ নতুন প্রজন্মকে ভয়াবহ ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এই বিজাতীয় সংগীতের প্রবক্তা এবং উচ্চাঙ্গ সংগীত শিল্পীদের মধ্যে লেগে আছে লাঠালাঠি। এই দুই প্রকৃতির সংগীতের সাথে নেই সাধারণ মানুষের সম্পর্ক। অর্থ, পদমর্যাদা এবং তোষননীতির বদৌলতে এরা অনেকেই সংগীত জগতের বিরাট ব্যক্তিত্ব হয়ে বসে আছেন। একদিকে আধুনিকতার নামে কেউ বিকৃত সুর- বাণীর বিষবাস্প ছড়িয়ে দুষিত করছেন সংস্কৃতির পরিমণ্ডল, অন্যদিকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের সৌন্দর্য এবং রসতত্ব চর্চা করে বছরের পর বছর যুগের পর যুগ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে কাটিয়ে দিচ্ছেন কেউ কেউ। "সংগীতই ব্রস্ম" এই তাদের ধ্যান। অথচ এই সংগীতের কিছুই বুঝে না সাধারণ মানুষ। উচ্চাঙ্গ সংগীতের পণ্ডিতেদের ধারণা যত কম মানুষ এই সংগীতকে বুঝবে তত বেশী বাড়বে তাদের পাণ্ডিত্যের ভার। এই সংগীত সাধকরা মনে মননে রাজ রাজাদের বংশধর। উপাধীর পর উপাধী নামের অগ্রে পশ্চাতে। উচ্চাঙ্গ সংগীতজ্ঞদের এই রক্ষণশীল মনোবৃত্তি পরিহার করে শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীতই নয়, দীর্ঘকালের সঞ্চিত বিভিন্ন রাগ, রাগিনী, সুর যুগপযোগী রূপে সংগীতের সমৃদ্ধি সাধনে ব্যবহার করা দরকার। মনে রাখতে হবে মানুষ সংগীতের জন্য নয়, সংগীত মানুষের জন্য। সেই মানুষ গুটি কতক ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যাপক জনগোষ্ঠী।

বাংলাদেশের লোকজীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-স্বপ্ন, সরল সহজ ভাষায় সুরে বিধৃত যে সংগীত সেই লোক সংগীতও বিলুপ্তের পথে। অথচ এই লোক সংগীতে একদিকে স্বত:স্ফুর্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে মাঝি মাল্লার জীবনালক্ষ্য, কৃষক কৃষাণীর সোনালী ফসলের স্বপ্ন, ব্যথা বেদনার চিত্র। অন্যদিকে তাদের জীবন সংগ্রামের কথা। এসবের চর্চা আর হচ্ছে না। আধুনিক চাকচিক্যের মোহে অনুকরণ প্রিয় কিছু লোক আমাদের সংগীতে বিকৃত রুচির অনুপ্রবেশ ঘটাচ্ছে।

চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের রচনা সৌকর্য সম্পর্কে আমার ধারণা নেই বললেই চলে। চিত্রকলার বিভিন্ন প্রদর্শনীতে কখনো সখনো ঘুরেছি। আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য

www.pathagar.com

স্বনামধন্য শিল্পীদের সাতরঙের কুশলী খেলা, নগ্ননারীর মূর্ত- বিমূর্ত রূপ কিংবা আধুনিক নান্দনিকতার কোন কিছুই আমার মাথায় ঢুকাতে পারিনি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গ্যালারী কিংবা গুলশান বনানী বারিধারার রাজকীয় ড্রয়ীং রুম সাজাবার জন্যই কি আমাদের চিত্রকলা?

দেশে প্রতিভাবান অনেক শিল্পী রয়েছেন। সেই সব শিল্পীদের শিল্প কর্মে রূপায়িত হতে পারে মানুষের যুগ যন্ত্রণা, অস্তিত্ব সংকট এবং এই সংকট থেকে উত্তরণের দৃপ্ত চেতনা। আমাদের এই প্রজন্মের শিল্পীদের নিশ্চয়ই জানা আছে তাদের পূর্বসূরীরা সাধারণ মানুষের দু:খ-কষ্ট, বন্দিত্বের যন্ত্রণাকে কত সহজ সরল ভাবে তুলির স্পর্শে জীবন্ত করে তুলেছিলো। সেই তেতাল্লিশের মন্বন্তরের ছবি, স্কেচ আজও মানুষকে উজ্জীবিত করে শৃঙ্খল মুক্তির আকাঙ্খায়।

সাংবাদিকতাও একটি মহৎ শিল্পকর্ম। সাংবাদিকরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাঙ্খার কথা স্বার্থকভাবে তুলে ধরে রাজনৈতিক চেতনা উদ্দীপনার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা লুণ্ঠিত। সংবাদপত্রে স্বাধীন মত প্রকাশে সরকার এবং মালিকপক্ষ থেকে দুভাবেই বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন সাংবাদিকগণ। এছাড়া বেশ কিছু সাংবাদিকের রক্ষণশীলতার কারণে নতুন যুগ চেতনার সংবাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে দেশের মানুষ।

মানুষের স্নায়ুতন্ত্রকে বিকল করে দিতে এক শ্রেণীর শিল্পী লেখকরা যেমন বিকৃত ও অশ্লীলতাকে তাদের লেখার বিষয়বস্তু করছেন, অন্য শ্রেণীর লেখায় শিল্পকর্মে ধর্মীয় অনুশাসন এবং অলৌকিক বিশ্বাসের কথা। সামাজিক ক্ষেত্রে মোল্লা মৌলভি, ব্রাহ্মণ পুরহিতদের পুঁথি পত্রের বিধি বিধান মোতাবেক সামান্য দাম্পত্য কলহে অকস্মাৎ তালাক দিয়ে ফেলা দম্পতিরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্টে এবং চরম নিগ্রহের মধ্যে দিনাতিপাত করেন। তালাক প্রাপ্ত মহিলারা হন ফতোয়াবাজদের হিংস্রতার শিকার। এসব এবং ধর্মরক্ষার নামে নূরজাহান, ফিরোজার মত অসংখ্য কর্মজীবি নারীদের ওপর ধর্মব্যবসায়ীদের অমানবিক নির্যাতনও নাকি আমাদের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির অঙ্গ!

এই প্রচলিত শাসন, শোষণ, বঞ্চণা, লাঞ্ছণা সৃষ্টিকারী সংস্কৃতির বিপক্ষে কোন কথা বললে, সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খার কোন চিত্র, কবিতা, গল্প প্রকাশিত হলে, শাশ্বত সংস্কৃতির অবমাননার জন্য টিকি ও টুপিওয়ালাদের চলে লাঠি মিছিল। তাদের এই হিংস্র আক্রমণের পেছনের কলকাঠি সামন্তবুর্জোয়া শ্রেণীর পরিচালিত শাসক গোষ্ঠী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

www.pathagar.com

এই সামাজিক সংকট মুহূর্তে হতাশায় নিমজ্জিত সাধারণ মানুষ আরো ভেঙ্গে পড়েন। শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে রাখা এই সাধারণ মানুষের মনে তখন দ্বিদ্বাদ্বন্দ্ব আরো বেড়ে যায়। শ্রেণী সচেতনতার অভাবে বুঝতে পারে না নিজেদের দুঃখ দুর্দশার প্রকৃত কারণ। তখন ভাবে সত্যিই কী তাদের জীবনে পরিবর্তনের আর কোন আশা নেই? এই অবহেলা, দৈন্যতা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সত্যই কী তাদের ভাগ্য লিখন? সাধারণ মানুষের এই অসচেতনাতার সুযোগকে তখন সদ্ব্যবহার করেন তথাকথিত ধর্মীয় পুরহিতগণ। দেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবিরাও পদোন্নতি, ক্ষমতা ও খ্যাতির মোহে নিস্তব্ধ, প্রতিবাদহীন থাকেন।

এই সংকটজনক পরিস্থিতির সীমাহীন অন্ধকারে আশার আলোর বর্তিকা হবে সচেতন লেখক শিল্পীর সাহিত্য ও শিল্পকর্ম। শিল্পী তার তেজস্বী শিল্প কর্মের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে তীব্র করে তুলবেন। জীবন ও জগৎকে অনন্ত সম্ভাবনাময়, আনন্দময় রূপে উপস্থাপনা করবেন। লেখক তার লেখনীর মাধ্যমে সচেতন করে তুলবে মানুষকে। ইস্পাত কঠিন চেতনার অধিকারী হবেন লেখক ও শিল্পীরা। দেশ জাতি ও মানবতার সপক্ষে অত্যন্ত সাহসের সাথে সৃষ্টি করে চলবে অমিতধারা শিল্প।

বিরাজমান সংকটের অবসান কল্পে গতিময় জীবনকে অবলম্বন করে সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে যে লেখক শিল্পীরা কাজ করে যান তারাই প্রকৃত প্রগতিশীল। সমাজকে সচল এবং গতিময় রাখার সচেষ্ট সংগ্রামে তারা তাদের মেধা এবং শ্রমকে নিয়োজিত করেন। অধঃগতি বা স্থবির সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে সমবন্টনের নতুন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে যে সাহিত্য, শিল্পকর্ম; তাই প্রগতিশীল সাহিত্য শিল্পকর্ম। এই শিল্পকর্ম হবে সাধারণ মানুষের রাজনীতি, শোষণহীন তথা প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কীত। প্রগতিশীল লেখক শিল্পকর্মীকে অবশ্যই শ্রমজীবি মানুষের রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী হতে হবে। রাজনীতি বাদ দিয়ে সমাজ বা মানুষ চলে না। মানুষের যাবতীয় সমস্যা, ক্ষুদা, দারিদ্র, শোষণ সবই রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে। একজন সচেতন শিল্পীর বস্তু থেকে চেতনা, চেতনা থেকে সূত্র; জ্ঞান বিকাশের এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিপ্লবী তত্ত্ব ও মতাদর্শিক ভিত মজবুত না থাকলে একজন লেখক শিল্পী কখনো প্রগতিশীল হতে পারেন না। এর জন্য তত্ত্বগত চর্চা, অধ্যায়ন, অনুশীলনের প্রয়োজন। যারা একটা নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন তাদের দায়িত্ব অনেক।

শিল্পকলার বিভিন্ন মাধ্যম যেমন সাহিত্য, সংগীত, চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য, স্থির চিত্রের মাধ্যমে শিল্পী চলমান সমাজের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে দর্শক, শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এইসব

www.pathagar.com

শিল্পকলা সমাজবদ্ধ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিপুল আবেগ এবং চেতনা জাগ্রত করে থাকে। এই মাধ্যমগুলোর বিভিন্ন দিক এবং টেকনিক সম্পর্কে সচেতন শিল্পীকে জ্ঞানার্জন করতে হয়। প্রগতিশীল শিল্পী সাহিত্যিকগণ এই মাধ্যমগুলোর সাহায্যে জনগণের কল্যাণে সামাজিক মূল সমস্যার উৎস সন্ধানে নিরলস প্রচেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করেন।

একজন প্রগতিশীল লেখক শিল্পী জানেন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা তথা উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে নতুন উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে তোলা ছাড়া বর্তমান সংকট থেকে মুক্তি আসতে পারে না। শোষণ নিপীড়ন মূলক সমাজ ভেঙ্গে নতুন গণতান্ত্রিক সমাজ গড়ার নেতৃত্বদানের ক্ষমতা শুধু সর্বহারা শ্রেণীরই আছে। দেশের প্রচলিত আইন-কানুন, রাজনীতি, ধর্ম, শিল্পকলা তথা দর্শন, সংক্ষেপে মতাদর্শিক আকারগত পার্থক্যগুলোকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করে আমাদের দেশের এই শ্রেণী-রাজনীতি বিকাশের সপক্ষে অনেক দায়িত্ব নিতে হবে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের।

যেহেতু এখনও ব্যাপক সাধারণ মানুষ শ্রেণী সচেতন হয়ে ওঠেনি, বিশেষ করে সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবী শক্তি আজও প্রয়োজনমত ও আশানুরূপভাবে সংগঠিত নয়, তাই শিল্পী সাহিত্যিকরা এদেশের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রগতিশীল ভূমিকা রাখতে পারেন। তাদের কাজ হবে সংগীত, ভাস্কর্য, নাটক এবং শিল্পের অন্যান্য মাধ্যমগুলোকে ব্যবহার করে সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন থেকে আশা নিরাশার দোলায় দোলা একটি শতাব্দী চলে গেল। পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা কি দেখছি? ধর্মের নামে নিকৃষ্ট শ্রেণী স্বার্থ উদ্ধার, হতাশাচ্ছন্ন যুবকদের একাংশ ঝুঁকে পড়ছে মৌলবাদের দিকে। ফাঁক ফোকর খুঁজে কোথাও কোথাও ঢুকে যাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতি এনজিও গুলোর মাধ্যমে। অন্ত:সার শূন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের হাটদখলে মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশলক্ষ শহীদ রাজনৈতিক কুশলী খেলোয়াড়দের দাবার গুঁটি। কখনো স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ শক্তি, কখনো নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য হা মাতম করছে প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো। মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে সমাজ বিপ্লব ঠেকানোই তাদের উদ্দেশ্য। জিটিভি, স্টার এবং ভিডিওর আগ্রাসণতো আছেই। অন্যদিকে মত প্রকাশের স্বাধীনতায় সরকার এবং বুর্জোয়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফতোয়াবাজ ও মৌলবাদীদের নগ্ন হস্তক্ষেপ। এই ধর্মব্যবসায়ীরা ব্লাসফেমী আইনের মাধ্যমে তাদের হীন

www.pathagar.com

ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের পথ নির্বিঘ্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সাম্প্রদায়িক উস্কানী, বইপত্রের দোকান ও পত্রিকা অফিসে হামলার মত বর্বরোচিত ঘটনা ঘটছে অহরহ।

ক্ষমতাশীন ও ক্ষমতাপ্রার্থী শাসক শোষক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বকারী বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলো আরো সম্পদশালী হবার অদম্য কামনায় গণ বিরোধীতো বটেই, চরম জাতীয় স্বার্থ বিরোধী শক্তিতে পরিণত হয়েছে। এদের শ্রেণী চরিত্র হলো দেশের বর্তমান আধা-উপনিবেশিক, আধা-সামন্তবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। অতীতের রাজা-বাদশা, উপনিবেশবাদী বৃটিশ, জমিদার, নীলকর সাহেবরা যা যা করেছে, তারাও তা-ই করছেন। তবে এদের শোষণের কৌশল একটু ভিন্ন। সারা দেশব্যাপী এসব ধোকাবাজদের চাটুকাররা ভালমন্দ ন্যায় অন্যায়ের বিচার বিশ্লেষণ না করে সুবিধার লোভে বিবেক বর্জিত কাজে লিপ্ত।

সাধারণ মানুষকে স্বর্গে নেবার পথ প্রদর্শক রূপে একের পর এক ক্ষমতা বদলে নিচ্ছেন এই দলগুলো। কালো টাকার ভোটাভুটির খেলায় মানুষকে মাতিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে নেয়াই তাদের কাজ। রাজনীতিবিদদের এই অধ:পতন সারা দেশের মানুষের কাছে একটা প্রশ্নের উদ্রেক করেছে। এই সংকটের মুখে জনগণ আজ চরম অসহায়, দিশাহারা। সমগ্র তরুণ সমাজ বিচলিত ও পথভ্রষ্ট। সময় এসেছে এইসব সুযোগের সদ্ব্যবহারকারীদের জীবনে প্রচণ্ড আঘাত হানার।

বিশ্বের সকল শোষিত ও নিপীড়িত জনগণ তাদের অতীতের ভূলভ্রান্তি সংশোধন করে আবার নতুন ভাবে বিশ্বের সব ধরনের শোষণের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমরাও তাদের সাথে এই পঞ্চদশ শতাব্দীকে চিহ্নিত করতে চাই সকল শোষিত নিপীড়িত ও বঞ্চিত জনগণের বিপ্লব ও মুক্তির শতাব্দী হিসেবে।

রাজনীতিতে সমাজ ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন তথা গুণগত পরিবর্তনের যে যুদ্ধ তা হলো বিপ্লবী যুদ্ধ। বিপ্লবী যুদ্ধের স্তর ভেদে (যেমন নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লব, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব) নির্ধারিত হয় রণকৌশল। প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদেরও সে যুদ্ধের স্তর ভেদে তাদের লেখনী বা শিল্পকর্মের হাতিয়ারকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে হবে। ইয়েনান ফোরামে শিল্প সাহিত্য প্রসঙ্গে কমরেড মাও সে-তুঙ যথার্থই বলেছিলেন- 'সামরিক ও সাংস্কৃতিক উভয়ক্ষেত্রে মূল চালিকা হলো বিপ্লবী রাজনীতি। সামরিক ক্ষেত্রে যোদ্ধা ও হাতিয়ার ছাড়া যেমন যুদ্ধ চলে না, তেমনি সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যোদ্ধা অর্থাৎ লেখক, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিকের প্রয়োজন। আর তাদের হাতিয়ার হলো গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি।'

www.pathagar.com

সংস্কৃতি সম্পর্কে কথা বলা বা কিছু করার সোল এজেন্সী খুলে বসে আছেন প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর মদদপুষ্ট বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন ও জোট। এই জোটের নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি এবং হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের নিমিত্তে পরিচালিত হচ্ছে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড। তাদের এই অপতৎপরতা সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে প্রগতিশীল শিল্পকর্মীদের।

বর্তমানে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের সংগ্রাম হবে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে। যারা বিভিন্ন ধর্মের পচাঁপূঁজ গন্ধময় ঐতিহ্যের ধারক, বাহক, প্রচারক। তারা সাম্রাজ্যবাদী, লুটেরা বুর্জোয়া ও সামন্তবাদী চিন্তা ভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়ে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে দুষিত করছে। প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের এই মুহূর্তের কাজ সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামকে সহায়তা করা। অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতি হবে নয়াগণতান্ত্রিক সংস্কৃতি।

প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের মধ্যে আমরা একটি সমস্যা লক্ষ্য করে থাকি। এসব শিল্পী লেখকদের মধ্যে পেটিবুর্জোয়া রোমান্টিসিজম কাজ করে। তারা কেউ কখনো কখনো প্রগতিবাদী, আবার যুগের হাওয়ায় নাম যশ প্রতিষ্ঠার লোভে প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে আত্মসমর্পণকারী। এসব লেখক শিল্পীদের মধ্যে বিপ্লবী মতাদর্শিক ভিত-মজবুত না থাকার কারণে আত্মস্বার্থ আদায়ের জন্য এরা কেউ কেউ সুবিধাবাদী লাইনকে গ্রহণ করে থাকেন। এই বিচ্যুতি এড়াবার লক্ষ্যে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীকে সংগঠনভূক্ত থেকে প্রতিনিয়ত বিপ্লবী কর্মকান্ডে নিজেকে যুক্ত রেখে অনুশীলন চালাতে হবে। চলন্ত সামাজিক উৎপাদিকা শক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্ব সচেতন হওয়ার জন্য অধ্যাবসায় অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রগতিশীল শিল্পী লেখকরা একসময় প্রকৃত মার্কসবাদী বিপ্লবী চরিত্রের অধিকারী হয়ে ওঠবেন। যারা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ এর শিক্ষায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় চেতনার অধিকারী হবেন। কোন সাময়িক সুযোগ সুবিধার প্রলোভন যাদের কখনো পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। সমাজ বাস্তবতাই একদিন সে ক্ষেত্রে প্রস্তুত করে দেবে। বিপ্লবীযুদ্ধের সহযোদ্ধা হয়ে বিপ্লবী লেখক শিল্পী গড়ে ওঠবে সেদিন।

আমাদের দেশে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীর ভূমিকা অতীতের মত আজ ততটা প্রকট নয়। এর কারণ অনুসন্ধানে এই ছোট পরিসরে আমি যাচ্ছি না। বৃটিশ শাসিত ভারতের মুক্তির লক্ষ্যে, বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনের দাবীতে প্রগতিশীল লেখক শিল্পীরা যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছিলো। শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সংগ্রামে সহযাত্রী হবার আহ্বানে রচিত

www.pathagar.com

হয়েছিলো অনেক সংগীত, নাটক এমনকি চলচ্চিত্রও। সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই লেখক শিল্পীরা সমালোচনায়, প্রতিবাদে সোচ্চার করে তুলেছিলো মানুষকে। সেই প্রগতিশীল লেখক শিল্পীরা ছিলো মূলতঃ বাম রাজনীতিরই ফসল।

দুঃখজনক হলেও সত্য আজ বাংলাদেশে তৎকালীন বাম রাজনীতির এক বিরাট অংশ সামন্ত বুর্জোয়া শ্রেণীর সেবাদাস ও লেজুড়ে পরিণত। এই অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদেরও করণীয় এবং দায়িত্ব অনেক। ব্যক্তি এবং সমাজ জীবনের বহু সমস্যার সমাধান মানুষ আশা করে শিল্প সাহিত্যের কাছে। আমরা এই শিল্পী সাহিত্যিকদের সচেতনতার দিকে তাকিয়ে আছি উন্মুখ হয়ে। আমরা চাই প্রগতিশীল শিল্পী সমাজের কাছে প্রচলিত ব্যবস্থার উর্ধ্বে এক নতুনতর স্বপ্নের কথা শোনতে। লেখক তাঁর বলিষ্ঠ সমাজ সচেতন দৃষ্টিকে অনবদ্ধ কৌশলে ছড়িয়ে দেবেন তার লেখায়।

একটি কথা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে খুবই প্রচলিত, তা হলো- সাহিত্য ও শিল্প সমাজের দর্পণ। অবশ্য দর্পণ হওয়াই সাহিত্য শিল্পের বড় কথা নয়। মানুষের জীবনের আরো কিছু উন্নতর স্তরের ইঙ্গিত দেয়াও সাহিত্যের দায়। সেই ইঙ্গিতের প্রভাব শ্রোতা দর্শক পাঠকের জীবনে পড়ে।

দেশের কিছু সংখ্যক বাম চিন্তাধারী লেখক স্ব স্ব প্রচেষ্টায় আমাদের রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্যকে কেন্দ্র করে অনেক মননশীল প্রবন্ধ, নিবন্ধ, বই, পুস্তিকা লিখে যাচ্ছেন। এইসব লেখা পার্টিকর্মী এবং শিক্ষিত মানুষের চিন্তাভাবনাকে শাণিত করছে। আমরা এইসব বইপত্র পড়ে আত্ম সমালোচনার মাধ্যমে নিজেদের ভুলত্রুটিকে সংশোধন করতে পারছি। তবে মনস্তাত্বিকভাবে সাধারণ মানুষকে সংগ্রামে প্রস্তুত করার জন্য প্রবন্ধের বিষয় বক্তব্যকে যতটা সম্ভব সহজ সরল ভাবে প্রকাশ করা দরকার। যদিও আমার লেখায়ও এই ত্রুটিটি রয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে আমরা যাদের জন্য কাজ করছি সেই সাধারণ মানুষরা বেশীর ভাগই শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত।

সামন্ত ধ্যান ধারণায় লালিত যাত্রা শিল্প ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক এবং বিপ্লবী ভাবাদর্শে রূপান্তরিত হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণে বহু যাত্রাপালার বিষয়বস্তু মেহনতি মানুষের বিপ্লবী চেতনায় শাণিত। যাত্রাশিল্পী ও কলাকুশলীদের ন্যায় সংগত দাবি দাওয়াকে সমর্থন করে যাত্রা মঞ্চায়নের সকল বাধা প্রতিকুলতার বিরুদ্ধে আন্দোলনে প্রগতিশীল শিল্পীদের এগিয়ে আসা দরকার। মরে রাখতে হবে সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে যাত্রা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

www.pathagar.com

আমাদের দেশে বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে, গণ জাগরণের ক্ষেত্রে অসংগঠিত হলেও প্রগতিশীল লেখক শিল্পীরা বিভিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। আশার কথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সংগ্রামের শপথ উচ্চারিত হচ্ছে এই প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের সৃষ্টি কর্মে। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবনকে কেন্দ্র করে আমাদের সংস্কৃতি জগতে অনেক মেধার বিকাশ, উদ্ভাবনী শক্তির প্রকাশ আরেকটি সম্ভাবনার দিক। বাংলাদেশের সচেতন লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবিগণ অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন, সন্ত্রাস দমন কালাকানুন বাতিলের জন্য এবং সংবিধানে মৌলবাদীধারা সংযোজনের বিরোধীতা করে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন।

কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও লুটেরা বুর্জোয়া চেতনার ওপর ভর করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যতই প্রবলতর হচ্ছে, এ দেশের অন্যান্য জনগণের মত লেখক শিল্পীরাও তত শোষিত ও লাঞ্ছিত হচ্ছেন। তাই জনগণের নয়াগণতান্ত্রিক বিপ্লবের সপক্ষে তাদের সৃজনশীল কর্মের পাশাপাশি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদের সঙ্গবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। এই সঙ্গবদ্ধ প্রগতিশীল লেখক শিল্পীদেরকে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের ওপর নির্ভর করে বিপ্লবী শ্রেণী সংগ্রামের লাইন ধরে সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নয়তো আমরা শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে যতই বুলি আপচাইনা কেন, গ্রাম্য গায়েনের মত সামাজিক জীবনে পরাজিত হয়ে একদিন তারই সুরে বলতে হবে-

"কি কাম করলামরে গাজীর গীত গা'য়া
এক টাকা কামাই করলাম পাঁচ সিকা খা'য়া।"

www.pathagar.com

বিদ্রোহের প্রতীক মুমিয়া আবু জামাল

আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ লেখক সাংবাদিক, কালো জঙ্গীবাদী ব্ল্যাক পান্থার দলের সংগঠক মুমিয়া আবু জামালের মৃত্যু দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে যখন সারা বিশ্বের বিবেকবান মানুষ বিশেষ করে লেখক শিল্পী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ সোচ্চার; আমরা তখনও প্রভুভক্ত কুকুরের মত তথাকথিত কবি শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকরা এত বড় অন্যায় এবং বিচারের নামে অবিচারের বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করছি না। এটা বড়ই লজ্জা এবং দুঃখের বিষয়। তথাকথিত প্রগতিশীল মুক্ত বুদ্ধির দাবিদার লেখক সাহিত্যিক কবি সাংবাদিকদের ভীড়ের চাপে একুশ এলে বই মেলায় এবং বৈশাখ এলে রমনায় ঢোকা মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। যাই হোক এই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিবেকবান ক'জন প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীর প্রচেষ্টায় ১৬টি বামপন্থী পত্রিকা, ছাত্র, শ্রমিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন মিলে গড়ে তোলা হয় 'মুমিয়া আবু জামাল জীবন রক্ষা আন্দোলন বাংলাদেশ' নামে একটি সংগঠন। মুমিয়া আবু-জামালের মুক্তির দাবির আন্দোলনকে বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে এই সংগঠন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে। তার মধ্যে ১২ আগষ্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে মুমিয়ার জীবন ও সংগ্রামের ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শণী। ১৪ আগষ্ট প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে বিক্ষোভ সমাবেশ, প্রতিবাদ মিছিল ও মর্কিন দূতাবাসে মুমিয়া আবু জামালের অন্যায় মিথ্যে অভিযোগে মৃত্যুদন্ডাদেশের প্রতিবাদে স্মারক লিপি প্রদান। ১৭ আগষ্ট প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ। রাজশাহী সহ দেশের অন্যান্য স্থানেও ছাত্র যুবকরা স্কউদ্যোগে মুমিয়া আবু জামালের মুক্তির দাবিতে মিছিল সমাবেশ করেন। দুঃখজনক হলেও সত্য বিপ্লবী লেখক সাংবাদিক মুমিয়ার মুক্তির দাবিতে ঢাকায় যতগুলো সভা সমাবেশ হয়েছে তাতে ঘুরে ফিরে একই চেনা মুখ দেখা গেলো। দেশের স্বনামধন্য শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিকদেরতো নয়ই এমন কি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতা কর্মীদের অংশ গ্রহণ ছিল না বললেই চলে। এ

www.pathagar.com

ছাড়া মুমিয়ার ওপর মার্কিনী পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে তথাকথিত এই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কোন প্রতিবাদ বিবৃতিও আমরা খুঁজে পাইনি। অথচ মুমিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি চেয়ে ইতালীর রোম থেকে এক লক্ষ লোক লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। জার্মানীতেও প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত হয়েছে। মুমিয়ার পক্ষে পথে নেমে এসেছেন হলিউডের লেখক ও শিল্পীগণ। ফরাসী লেখক-দার্শনিক জেকুইস ডেরিডা মুমিয়া আবু জামালের পুনর্বিচারের দাবি উপেক্ষা করাকে "বিচারকের হৃদয় ও কানের বধিরতা" বলে নিন্দা জ্ঞাপন করেছেন। অন্যদিকে প্যারিসের চীনা কবি বেই দাও মুমিয়ার স্বপক্ষে কবিতা রচনা করে মুমিয়া আবু জামালের এই প্রাণদণ্ডাদেশকে একশত বছর পূর্বে অন্যায় ভাবে এক তরুণ ইহুদী সামরিক অফিসারের মৃত্যু দন্ডাদেশের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

মুমিয়া আবু জামাল কোন দেশের একক নয়; সারা বিশ্বের সম্পদ। যে কোন সৃষ্টিশীল লেখক শিল্পী সাংবাদিকের বেলায় একথা প্রযোজ্য। তাই পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই হোক বিবেকবান মানুষ মাত্রই সৃজনশীল কবি শিল্পী সাংবাদিকের ওপর হামলার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্যাতিত কালো মানুষের বিপ্লবী কণ্ঠস্বর সাংবাদিক লেখক মুমিয়া আবু জামাল। মুমিয়ার প্রতিবাদী কলম সর্বদাই নির্যাতিত গণ-মানুষের স্বপক্ষে গিয়েছে। তিনি কৈশোরে কালো মানুষের জঙ্গী সংগঠন ব্ল্যাক পান্থার পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। কৃষ্ণাঙ্গ সাংবাদিক এসোসিয়েশন ফিলাডেলফিয়া শাখার সভাপতি আবু জামাল বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও রেডিও-তে লেখনীর জন্য ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেন। নিজ দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশের শোষক শ্রেণী কর্তৃক জনসধারণের ওপর পরিচালিত যে কোন ধরনের নির্যাতন নিপীড়নের বিরুদ্ধেও মুমিয়া বার বার সোচ্চার হয়ে লড়েছেন। এই অসীম সাহসী সংগ্রামী বীর আমেরিকার পুলিশ ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের বহু অকথিত অধ্যায় জনসম্মুখে উন্মোচন করেছেন। মুমিয়ার বিশ্বাস 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা ন্যায় সঙ্গত'। মৃত্যুর দোর গোড়ায় বন্দি অবস্থায় থেকেও সংগ্রামী লেখক মুমিয়া অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেন নি। বরং এই বিপ্লবী সাংবাদিক খোদ সাম্রাজ্যবাদী দেশ আমেরিকায় বসেও মার্কসবাদী লেনিনবাদী মাওবাদী নেতা পেরুর গণযুদ্ধের মহান নায়ক কমরেড গণজারোর গ্রেফতার ও প্রহসণমূলক বিচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। পেরুর কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড গণজালো-এর জীবন রক্ষা আন্দোলনের একেবারে শুরু থেকে মুমিয়া যুক্ত রয়েছেন। অকুতোভয় চিত্ত মুমিয়া মৃত্যু দণ্ডাদেশ মাথায় নিয়ে দৃপ্তভাবে উচ্চারণ করেছেন- 'আমি লিখতে থাকবো, আমি প্রতিরোধ করতে থাকবো যে ব্যবস্থা গত ১৩

www.pathagar.com

বছর আগে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছে এবং এখনও চাচ্ছে, সে ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমি অব্যাহত ভাবে বিদ্রোহ করতে থাকবো।' এই কালো বিপ্লবী সম্প্রতি প্রকাশিত তার বই 'লাইভ ফ্রম ডেথ রো'তে আমেরিকার ফ্যাসিষ্ট কার্যকলাপ তুলে ধরে তথাকথিত সভ্যদেশ মার্কিনী পুলিশ বিভাগ থেকে শুরু করে বিচার ব্যবস্থার অনির্ভরযোগ্যতা, রাষ্ট্রযন্ত্রের পীড়ন এবং বিভিন্ন শোষণ নির্যাতনের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। মার্কিন ফ্যাসিস্ট সরকার এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করার জন্য ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে হত্যা মামলায় জড়িত করে। ঘটনা অতি তুচ্ছ। আজ থেকে ১৪ বছর আগের ঘটনা। ফিলাডেলফিয়ায় মার্কিন পুলিশ গাড়ী চালাবার আইন অমান্য করার অজুহাতে মুমিয়ার ছোট ভাইকে বেআইনীভাবে নির্যাতন করে। মার্কিন আইন মোতাবেক যা পুলিশ করতে পারে না। পুলিশের এই বর্বরোচিত নির্যাতন থেকে ছোট ভাই কুকিকে উদ্ধারে এগিয়ে গেলে মুমিয়া পুলিশের আক্রমণের শিকার হন। পুলিশের গুলিতে মারাত্মক ভাবে আহত মুমিয়ার অজ্ঞাতে গুলি লেগে পুলিশ অফিসার ডানিয়েল এর মৃত্যু হয়। এবং মৃত্যুর সব দোষ চাপিয়ে দেয়া হয় মুমিয়া আবু জামালের ওপর। গুলিবিদ্ধ আবু জামাল মারাত্মক আহত অবস্থায় এমন কি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় মার্কিন বর্বর পুলিশ কর্তৃক নির্যাতিত হতে থাকেন। প্রায় চৌদ্দ বছর মিথ্যে অপরাধে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মুমিয়ার ওপর বিভিন্ন ভাবে নিপীড়ন চালাতে থাকে। শুধু ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বনের কারণে মার্কিন বিচার ব্যবস্থা মিথ্যে সাক্ষীর মাধ্যমে প্রহসনমূলক বিচারে এই বিপ্লবী মুমিয়া আবু জামালকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রদান করে। মুমিয়াকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত করা হয়। পুলিশ অফিসার নিহত ডেনিয়েলের পোষ্টমার্টেমে যে বুলেট পাওয়া যায় তা পয়েন্ট ৪৪ রিভলবারের। অথচ মুমিয়া আবু জামালের নিকট যে রিভলবার ছিল তা পয়েন্ট ৩৮ রিভালবার। এত কিছুর পরও বিচারক আবু জামালের মৃত্যু দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন এবং পুনর্বিচারের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। এ কেমন বিচার? এ কেমন গণতন্ত্র! অথচ গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী মার্কিনীরা গণতন্ত্র রক্ষার নামে মানবাধিকার লংঘনের অজাহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাখে লাখে সৈন্য পাঠায়, পাঠায় বিমানবাহী রণতরী। মার্কিন নাগরিক প্রগতিবাদী সাংবাদিক মুমিয়া আবু জামালের ওপর নৃশংস এই অমানবিক ঘটনায় আমেরিকার ফ্যাসিষ্ট নোংরা চরিত্র আবারও উন্মোচিত হলো। কেবল মাত্র ভিন্ন রাজনৈতিক মতাবলম্বনের কারণে একজন বিপ্লবীকে এভাবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া নজীরবিহীন ঘটনা। দেশে বিদেশে সাম্রাজ্যবাদী মার্কিনীদের নির্যাতন নিপীড়ন আগ্রাসন যে ভাবে বেড়ে চলেছে তা প্রতিহত করতে না পারলে বিভিন্ন দেশ, জাতি এবং স্বাধীনচেতা মানুষের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই আজ অসম্ভব। এখন প্রয়োজন লেখক শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক, ছাত্র যুবক শ্রমিক কৃষক যার যে অবস্থান সেখান থেকে এই সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির সকল অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো।

www.pathagar.com

"দের নহিঁ হরম নহিঁ"

সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ। শাখা সিঁদুর মঙ্গল প্রদীপের অমঙ্গল রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হতে এককালে স্যেকুলার (Secular) দল বলে পরিচিত আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা মাথায় বাঁধলো ইসলামী পর্দা, হাতে নিলো মধ্যযুগীয় তস্‌বীহ। আল্লাহ্ গাফফুরুর রাহীমু (সৃষ্টিকর্তা ক্ষমাকারী পরম দয়াময়) বিমুখ করেননি তাকে। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলো ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪৩টি আসন পাইয়ে দিয়ে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রূপে শপথ গ্রহণ শেষে শেখ হাসিনা লটবহর ও ৪২ জনের কাফেলা নিয়ে গেলেন ইসলামের পবিত্র স্থান সৌদি আরব, মহান আল্লাহ্ তায়ালার প্রতি শুকরিয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে। পবিত্র ওমরাহ্ পালন এবং মদিনা মনোয়ারায় মহানবীর (সঃ) পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারতে যাওয়ার প্রাক্কালে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে শেখ হাসিনা বলেন- 'পবিত্র মক্কায় আমি মহান আল্লাহতায়ালার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব।' আল্লাহতায়ালার পরম অনুগত বিশ্বস্থ বান্দারই কথা। এবশ্য এ ব্যাপারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেও অকৃতজ্ঞ বলা যায় না। Give and take এর যুগে আল্লাহ্ কাহহারু (মহাশাস্তিদাতা) তাঁকে (খালেদাকে) যতটুকু দিয়েছেন তিনিও ততটুকুই শোকর শুজর করলেন চট্টগ্রাম সফরের সময় গাউসুল আযম মাইজভান্ডারীর মাজার জিয়ারত করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া গেলে শেখ হাসিনার মত তিনিও হয়তো (হয়তো কেন, অবশ্যই) জাঁকজমক আড়ম্বর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যবস্থা করতেন। যত অনিষ্টের মূল বেগম খালেদার ববকাটা ফাঁপা ফোলা চুল। একদিকে মানুষের দৃষ্টি নন্দন খালেদার কেশ বিন্যাস, অন্যদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হাসিনার মাথায় কালো কাপড়ের ঢাকনা। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর কাছে মানুষতো নস্যি। অতএব শেখ হাসিনার জয়, তারই শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ। ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা চরমোনাইর পীর হযরত মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম বলেছেন- 'আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার মাথায় ইসলামী পর্দা,

www.pathagar.com

হাতে তসবীহ দেশে ইসলামী প্রভাবেরই ফসল।'

অনাহার ক্লিষ্ট হাড্ডিসার শীর্ণ মানুষের বন্যা খরা পীড়িত ফসলহীন বিরান মাটিতে আর কত বিজাতীয় ফসল ফলবে? স্বাদহীন গন্ধহীন স্নায়ু বিকল করা অপুষ্টিযুক্ত এ খাদ্য বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শত শত কাল ধরে ফলানোর চেষ্টা চলছে বিনা বাঁধায় বিনা দ্বিধায়। সত্যি সেলুকাস, কী বিচিত্র এ দেশ। বহিরাঙ্গে শরিয়ত সুন্নত তথা ধর্মকে শিখন্ডি করে ধূর্ত রাজনীতিবিদদের ফয়দা লুটে নেয়ার কী বিচিত্র কৌশল। অদৃশ্য শক্তির জুজুর ভয় অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকদের দাবিয়ে রাখার বাহ কী মোক্ষম অস্ত্র।

এদেশেই নয়, ধর্মের নামে বিশ্বব্যাপী দানবীয় মৌলবাদের পুনরুত্থান এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের শোষণ প্রক্রিয়ার স্বার্থে বহুদেশে অশিক্ষিত মানুষের কালচার ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় ঢেলে যাচ্ছে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ডলার।

ধর্মের নামে যুদ্ধ মানে সাম্রাজ্যবাদের কোটি কোটি টাকার অস্ত্র বিক্রি।
ধর্মের নামে রাষ্ট্র দখল মানে শোষণের অবাধ ক্ষেত্র প্রস্তুত।
ধর্মের নামে বিচ্ছিন্নতার আন্দোলন মানে সাম্রাজ্যবাদের পুরোপুরি করায়ত্বে না আসা।
ধর্মের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি মানে এ সুযোগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীদের উপযুক্ত শায়েস্তা করা।
ধর্মের নামে ক্ষমতা দখল, শোষণ প্রক্রিয়া সমুন্নত রাখা।

ধর্মের নামে সন্ত্রাস হানাহানি রাহাজানি ধর্ষণ লুটতরাজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। এছাড়াও পরধর্ম পররাজ্য গ্রাসে ধর্মের ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। ধর্ম প্রচারের নামে মূলত রাজ্য বিস্তারের অভিযান সংগঠিত হয়েছে যুগে যুগে। খোলাফায়ে রাশেদীন শাসন আমলে খলিফাগণ দুর্দান্ত প্রতাপে রাজ্য বিস্তারে সাফল্য অর্জন করেন। ইসলামের ইতিহাসে যা গৌরবোজ্জল সোনালী যুগ বলে অভিহিত করা হয়। খোলাফায়ে রাশেদীনের পরেও উমাইয়া, আব্বাসী ও তাদের উত্তরাধিকারীদের রাজ্য দখলের অভিযান অব্যাহত থাকে। পরবর্তীতে মুসলমান খলিফা ও শাসকদের অযোগ্যতা, মাত্রাতিরিক্ত ভোগ বিলাস, মদ, নারীসঙ্গ সাম্রাজ্য বিস্তারের শক্তিকে দুর্বল করে দেয়। ফলশ্রুতিতে নতুন শক্তির উদ্ভব ঘটলেও শাসন শোষণ এবং রাজ্য লিপ্সা চরিতার্থে ধর্মোম্মদনা সৃষ্টি এবং এবং ধর্মের ব্যবহারে কোন ব্যত্যয় ঘটে না। পৃথিবীর বুকে অনেক অনেক রক্তপাত ঘটিয়েছে ধর্ম। সভ্যতা সংস্কৃতির অগ্রযাত্রাকে

www.pathagar.com

বার বার বাধাগ্রস্থ হতে হয়েছে ধর্মের পশ্চাৎমুখিতার প্রতিবন্ধকতার মুখে। সভ্যতা এগিয়ে যায় নতুনকে অর্জন করে, ধর্ম বেঁচে থাকে পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে। অন্ধ বিশ্বাস, ভয়ভীতি, অজ্ঞতা এবং অতীত ঐতিহ্যমুখিতা মানুষের আত্মশক্তিকে পঙ্গু করে দেয়। আর এসব টিকে থাকে ধর্মের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে। সামাজিক সম্প্রীতি, সাম্য, মানবিকতাবোধ ধর্মের আবরণ হলেও জাতি বর্ণভেদ সাম্প্রদায়িকতা এবং আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য জিইয়ে রাখাই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং আর্থিক সাম্যতা বিধানে ধর্মের কোন প্রয়োগযোগ্যতা বা কার্যকারিতা নেই। ধর্মের নৈতিকতাবোধ ও তত্ত্বকথা এবং তার বাস্তব প্রয়োগ বা ব্যবহার যোগ্যতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। আজকের যুগের চাহিদা মিটাতে তাই সে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম। তবু ধর্ম আছে দুর্দান্ত প্রতাপ প্রতিপত্তির সাথে। ধর্মের অচলায়তনে ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম্য-শহুরে, যুবা-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের প্রচণ্ড ভীড়।

ভীড় আটরশি, চরমোনাই, শর্ষিণার পীরসহ অসংখ্য খুদে বড় ধর্ম গুরুদের ওরসে দরবারে।
ভীড় কবরে মাজারে, দরগা- দরবার শরীফে।
ভীড় ধর্ম ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর অফিস আঙ্গিনা সভা সমাবেসে।

ভীড় মোহরম, জন্মাষ্টমী, জসনে জুলুসে ঈদে মিলাদুন্নবী (সঃ) মিছিলে। তাছাড়া ঈদ, বকরী ঈদ, কোরবানীর হাট, দুর্গাপূজাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জমজমাট আচার আয়োজন। নিরন্ন অসহায় মানুষকে উপহাস করে মসজিদ-মন্দির-গীর্জা-মঠ-পেগোডার স্থাপত্য সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে কোটি কোটি টাকা ব্যয়।

ওপরোক্ত আচার উপাচার নিয়ে অনেক প্রশ্ন, অনেক তর্ক। কিন্তু সেই প্রশ্নের উত্তর নেই, নেই সেই তর্কের সমাধান। হিন্দু ধর্মের সংস্কারকগণ জরাক্রান্ত ধর্মের চুনকাম বা সংস্কারের মাধ্যমে ধর্মকে কালোত্তীর্ণতার চেষ্টা করেও ব্যর্থ। আর মুসলিম আচার উপাচার সমূহ শরিয়ত বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও অন্তঃসার শূন্যতার কারণে ধর্মকে টিকিয়ে রাখতে এই বাহ্যিক জৌলুসের আয়োজন সুদুর প্রসারী চিন্তারই ফসল।

বর্তমানে বিশ্ব ব্যবস্থায় জীবন যাপনের ক্ষেত্রে শরিয়ত সম্মত অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীক সামাজিক বিধি বিধান আইন শৃঙ্খলা কারো পক্ষে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলা সম্ভব নয়। যদিও ইসলামের অস্তিত্বের সাথে শরিয়ত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ধর্মের সকল রীতিনীতি পদ্ধতির সমন্বিত রূপকে শরিয়ত বলা হয়। আজ সর্বক্ষেত্রে কোরআন হাদিসের আদেশ নির্দেশ পুঙ্খানুপুঙ্খ

www.pathagar.com

ভাবে মেনে নিলে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকে না। শঠ রাজনীতিবিদগণ ও ধর্মীয় মোড়লগণ এসব বিষয়ে ভালভাবে জেনে বুঝে নিজেদের স্বার্থে প্রয়োজনে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মকে শিথিল করছেন, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মের কঠোরতা আরোপ করা হচ্ছে। ধর্ম তাই আজ এক বিকৃত রূপে আমাদের সামনে উপস্থাপিত।

একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে, চোখ কান খুলে মুক্ত মন নিয়ে তাকালে ধর্মের বিকৃত কিম্ভুতকিমাকার রূপ আমরা দেখতে পাবো আমাদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, এমন কি আমাদের নিত্যদিনের জীবন যাপন, নিষ্ঠা, বিশ্বাস, অবিশ্বাসের মধ্যেও। কলেবর না বাড়িয়ে আমি সংক্ষেপে আমাদের বর্তমান প্রচলিত কিছু সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিষয়, জীবন যাত্রা, আচার আচরণ এবং এ সম্পর্কীত পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের দু'একটি বিধি বিধানের কথা উল্লেখ করতে চাই। পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফে উল্লেখ রয়েছে "আল্লাহ ঈমানদার নারীগণকেও আদেশ করিতেছেন তাহারা যেন (পুরুষগণের সম্মুখে) নিজেদের নয়ন অবনত করে এবং স্ব স্ব গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণ করে। যাহা স্বত প্রকাশিত হয় তাহা ছাড়া যেন স্বীয় বেশ বিন্যাস প্রদর্শন না করে এবং তাহারা যেন স্বীয় গ্রীবা ও বক্ষের উপর আবরণী দেয়। তাহারা বেশ বিন্যাস সহ কেবল নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের সম্মুখে বাহির হইতে পারিবে ঃ (১) স্বামী (২) পিতা (৩) স্বামীর পিতা (৪) পুত্র (৫) স্বামীর পুত্র (৬) স্বীয় ভ্রাতা (৭) ভ্রাতুষ্পুত্র (৮) ভগ্নীর সন্তান (৯) আপন নারীগণ (১০) অধীন দাসীগণ (১১) অথর্ব দাসগণ। (১২) নারীদের আবরণীয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছোট বালকগণ। তাহারা যেন এমন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে যাহাতে তাহাদের আবরণীয় অলংকার সমূহ প্রকাশিত হয়। তোমরা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যেন তোমরা সফল কাম হইতে পারো।" (সূরা নূর, আয়াত-৩১)। বর্তমান অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে সামাজিক রাষ্ট্রীক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তাতে কি নারীদের উক্ত নির্দেশানুযায়ী বেঁধে রাখা সম্ভব? না কিছুতেই নয়। তবু কাঠমোল্লারা ফতোয়া দিয়ে বলেছেন- কোরআন করীমে আরো ঘোষণা করা হয়েছে- "পুরুষগণ নারীগণের উপর ক্ষমতাবান। কেননা আল্লাহ পাক তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।" (সূরা নেসা, আয়াত-৩৪)। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় মেয়েদেরকে ঘরের মধ্যকার সমস্ত কাজকর্মের জন্যই যখন নেতা বানানো হয়নি; আর রাষ্ট্র যেহেতু বহু ঘরের সমন্বয় সেখানে নেতা নারী হতেই পারে না। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসুল (দঃ) এরশাদ করেন- "সে জাতি কখনও সফলকাম হতে পারবে না, যারা তাদের নেতৃত্ব নারীদের ওপর অর্পণ করেন।" আয়াতে কারীমা ও বিভিন্ন হাদীস দ্বারা সমস্ত

www.pathagar.com

ওলামায়ে কেরাম একমত হয়েছেন যে, মহিলাদের নেতৃত্ব করা হারাম। রাষ্ট্রের নেতৃত্বের দায়িত্ব কোন মহিলাকে দেওয়া জায়েজ নেই। মোল্লাদের এই ফতোয়াকে বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন করে এই না জায়েজ হারাম কাজটি ৯০ ভাগ মুসলিম অধ্যুষিত দেশে ঘটে গেল ঢাকঢোল পিটিয়ে ৯১ ও ৯৬ সালে। মূল শরিয়ত বিসর্জিত হলো ৯১- এর বিস্‌মিল্লাহ এবং ৯৬ এর মাথায় ইসলামী পর্দা রক্ষার্থে। এ প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ল। ছোট বয়সে কোথাও শুনেছিলাম হয়তো। এক সদ্য বিবাহিত যুবক শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছে বেড়াতে। বাড়ির মুরব্বিগণ আদব-কায়দা লেহাজ তবিয়ত সম্পর্কে যুবককে অনেক জ্ঞান দিলেন। বলে দিলেন কিছুতেই মাথায় টুপি ছাড়া শ্বশুরালয়ে যাওয়া যাবে না। মাথায় টুপি থাকা রাসুলের সুন্নত। শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার পথে নদী সাঁতরাতে গিয়ে যুবকের টুপিটি হারিয়ে গেলে খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ল। কিন্তু মুরব্বীদের নির্দেশ শ্বশুরালয়ের সামনে গেলে অবশ্যই মাথায় সুন্নত রক্ষা করতে হবে। হঠাৎ যুবকের বুদ্ধি খুলে গেল। যুবক পরনের লুঙ্গী খুলে মাথায় বেঁধে সুন্নত রক্ষার্থে লেহাজ তবিয়ত মত শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হলো। সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এদেশ।

ব্যাংক বীমা ইত্যাদি আধুনিক অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম মূল সোপান। এ ব্যাংক বীমাকে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়ে থাকে- "সুদখোরদের আইনসম্মত প্রতিষ্ঠান"। ইসলাম মতে সুদ নেওয়া সুদ দেওয়া একটি জঘন্য অপরাধ। সূরা বাকারা আয়াত- ২৭৫ এ বলা হয়েছে- "আল্লাহ ক্রয় বিক্রয়কে বৈধ এবং সুদকে অবৈধ করিয়াছেন।"। এই সম্পর্কে মহানবী (সঃ) এর বক্তব্য- "সুদ এমন একটি গোনাহ যে, একে সতেরটি ভাগে বিভক্ত করলে তার সব চাইতে হালকা অংশটিও নিজের মায়ের সাথে যিনা করার সমান গোনাহের শামিল"- (ইবনে মাজাহ বায়হাকি)। অথচ বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে বেঁচে থাকা রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম- বাংলাদেশে এমন কেউ আছে কি যিনি প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই গোনাহ কাজটি করছেন না? প্রসঙ্গত বলতে হয় বাংলাদেশের যে টেলিভিশন আল্লাহর মসজিদে সালাত আদায় করার জন্য আযান প্রচার করে, পাশাপাশি সেখানেই বিভিন্ন ব্যাংক অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান তাদের লোভনীয় সুদের হার ঘোষণা দিয়ে সঞ্চয়ের জন্য জনতাকে আহ্বান জানাচ্ছে।

শরিয়ত মতে ছবি হেফাজত ছবি প্রদর্শন হারাম, কিন্তু বর্তমান যুগে স্কুল কলেজে ভর্তি হতে চাকুরী পেতে, ব্যাংক একাউন্ট খুলতে, পাসপোর্ট বানাতে এমন কি ভোটার হতে ছবি তোলা ছবি প্রদর্শনকে বৈধ করে নিতে হয়েছে। কোরআনে বার বার দুনিয়ার অসার ক্রিয়াকলাপ (ব্যাখ্যা দানকারীরা গান বাজনা, সিনেমা নাটক বুঝিয়েছেন) পরিহার করতে বলা হয়েছে। বাস্তব জীবনে কথিত অসার ক্রিয়া কলাপের অবস্থান কোথায়?'

www.pathagar.com

"তোমরা একে অপরের ধন সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করিও না এবং তোমাদের জ্ঞাতসারে লোকের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগের জন্য মিছামিছি বিচারকের নিকট উপস্থিত করিও না। (সর্ব প্রকার অবৈধ রোজগার- ঘুষ, চুরি, রাহাজানি, জবর দখল ইত্যাদি আল্লাহর আদেশেই নিষিদ্ধ)" সূরা বাকারা আয়াত- ১৮৮। ঘুষ, দুর্নীতি, জবরদখলে সর্ব সময়ে ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া আধিপত্য।

সূরা মায়িদা আয়াত-৯০ এ বর্ণিত- "হে বিশ্বাসীগণ, মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ধারক শর ঘৃণ্যবস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পারো।" মদ, জুয়ার ব্যবসা নির্বিঘ্ন করার জন্য লাইসেন্স প্রদান এবং মূর্তি পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে পুলিশ নিয়োগ আমাদের সরকারের অন্যতম কাজ। তাছাড়া ভাগ্য নির্ধারক শরের নতুন সংস্করণ সরকার অনুমোদিত 'যদি লাইগ্যা যায়' লটারীর কথা কারো অজানা নয়।

সূরা তওবা, পারা-১০, আয়াত- ৩৪-৩৫ এ উল্লেখ- "যাহারা স্বর্ণ ও রৌপ্য সংগোপনে সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং উহা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাহাদিগকে যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেওয়া হইবে। এই সমস্ত স্বর্ণ রৌপ্য নরকাগ্নির মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া ঐ সঞ্চয়কারীদের ললাটে, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে দগ্ধ করা হইবে, এবং বলা হইবে, এই গুলিই তোমরা নিজেদের জন্য গোপনে সঞ্চয় করিয়াছিলে।" বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের অনেক আয়ের উৎসের মধ্যে ইহার প্রথম দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত বড় বড় সোনা গহনার দোকানগুলো অন্যতম। সেখানে প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় শত শত অপ্সরীদের আনাগোনা। উদ্দেশ্য ধর্মের এই হুশিয়ারীকে উপেক্ষা করে সোনা গহনা ক্রয়, সঞ্চয়ও বটে।

পার্থিব জীবনের সুখ সমৃদ্ধির প্রচেষ্টা ধর্মে স্বীকৃত নয়। সূরা আলে- ইমরান, পারা ৩, রুকু ২, আয়াত ১৪-১৫ তে বলা হয়েছে- "মানুষের কাছে লোভনীয় হইয়া আছে- স্ত্রীগণের সন্তান সন্ততির এবং পুঞ্জীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যের এবং সুসজ্জিত অশ্বরাজির, পালিত পশুপালের এবং শস্যক্ষেত্রের আকর্ষণীয় মায়া মহব্বত। এইগুলি সবই পার্থিব জীবনের সম্পদ (এবং ক্ষণস্থায়ী) কিন্তু আল্লাহর কাছে রহিয়াছে পরিণামের মহা কল্যাণ। (আল্লাহ রাসুলকে বলিতেছেনঃ) তুমি বল, ইহা অপেক্ষা উত্তম সম্পদের সংবাদ আমি তোমাদিগকে জানাইয়া দিতেছি। যাহারা ধর্মভীরু এবং পরহিজগার (সংযমী ও ধৈর্যশীল) তাহাদের

www.pathagar.com

প্রতিপালক তাহাদের জন্য স্বর্গোদ্যান রাখিয়াছেন, যাহার নিম্নে স্রোতস্বিনী সমূহ প্রবাহিত, সেখানে তাহারা চিরকাল অবস্থান করিবে। সেখানে তাহাদের জন্য আরও রহিয়াছে পুত-পবিত্র সহধর্মিনীগণ এবং আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা। আল্লাহ্ তাহার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্যকারী।" পবিত্র কোরআন থেকে ওপরোক্ত উদ্ধৃতি সমূহ তুলে ধরার কারণ এটা বুঝানোর জন্য যে কোরআনকে আক্ষরিক অর্থে নয়, কোরআনকে বুঝা দরকার তার ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকার মধ্যে। তৎকালীন সমাজ বাস্তবতাই কোরআন শরীফের বিভিন্ন সূরার আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে যা জড়িত। এসব সূরা আয়াতে আমরা লক্ষ্য করি মধ্যযুগের একটি ভৌগলিক, সামাজিক ও আর্থিক বিশেষ অবস্থার বর্ণনা। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন থাকলেও এই স্বল্প পরিসরে তা সম্ভব নয় বিধায় আমি মুসলিম ধর্মগ্রন্থ কোরআন শরীফের সূরা সমূহের নাম এবং সে নামের বাংলা অর্থের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই–

(১) আল-ফাতেহা - উদ্বোধন, (২) আল - বাক্বারাহ - গাভী (৩) আল-ইমরান - ইমরানের পরিবার (৪) আন-নিসা - নারী (৫) আল-মায়েদা - টেবিলে খাদ্য পরিবেশন (৬) আল-আনআম - গবাদী পশু (৭) আল-আরাফ -মহিমা বা চূড়া (৮) আনফাল-যুদ্ধে লুণ্ঠিত মালামাল (৯) আত তওবাহ্ - অনুতাপ বা অনুশোচনা (১০) ইউনুস - পূর্ববর্তী নবী (১১) হুদ-হুদ গোত্র (১২) ইউসুফ - পূর্ববর্তী নবী (১৩) আর-রাদ - বজ্র নির্ঘোষ (১৪) ইব্রাহিম - ইব্রাহিম (আঃ) (১৫) জিহর - একটি জায়গার নাম (১৬) নাহল - মৌমাছি (১৭) বনী-ইসরাঈল - ইসরাঈলের সন্তান (১৮) ক্বাহফ - গুহা (১৯) মারইয়াম - মরিয়ম (২০) ত্বোহা-হা - আরবি বর্ণমালা, (২১) আম্বিয়া - নবীগণ, (২২) হজ্ব - তীর্থযাত্রা, (২৩) আল-মুমিনুন - বিশ্বাসীগণ, (২৪) আন-নূর - প্রদীপ বা আলো, (২৫) আল-ফুরকান - বিচারের মান বা নীতি, (২৬) আশশোআরা - কবিগণ, (২৭) আন-নমল - পিপীলিকা, (২৮) আল-ক্বাসাস - গল্পকাহিনী, (২৯) আল-আনকাবুত - মাকড়শা, (৩০) আর রাম - রোমান জাতি, (৩১) লোকমান - ব্যক্তির নাম, (৩২) সেজদা - প্রণত, (৩৩) আল-আহযাব - এক বংশীয় উপজাতি, (৩৪) সাবা - ইয়েমেনের একটি স্থান, (৩৫) ফাতির - দেবদূতগণ, (৩৬) ইয়াসীন - আরবি বর্ণমালা, (৩৭) আস সাফফাত - যারা ঐক্য প্রতিষ্ঠা করে, (৩৮) ছোয়াদ - আরবি বর্ণমালা, (৩৯) আয-যুমার - সৈন্যদল, (৪০) আল-মুমিন - বিশ্বাসী, (৪১) হা সীম-সেজা - ব্যাখ্যা (৪২) আশ-শুরা - মন্ত্রণা, (৪৩) আয-যুখরুফ - স্বর্ণের গহনা (৪৪) আদ-দোখান - ধূম্র বা ধোঁয়া, (৪৫) আল-জাসিয়া - ভয়ে বা হীনভাবে

www.pathagar.com

আনত (৪৬) আল-আহক্কাফ - বাতাস পাহাড় রাজিকে ঢেকে দেয় বালিতে, (৪৭) মুহম্মদ - মুহম্মদ, (৪৮) আল ফাতহ্ - বিজয়, (৪৯) আল-হুজরাত - ব্যক্তিগত আবাস, (৫০) ক্বাফ - আরবি বর্ণমালা, (৫১) আয যারিয়াত - শস্য ঝাড়াইকারী বাতাস, (৫২) আত-তুর - পর্বত, (৫৩) আন-নাজম - নক্ষত্র, (৫৪) আল-ক্বামার - চাঁদ, (৫৫) আর-রাহমান - হিতকর, (৫৬) আল-ওয়াকিয়াহ - ঘটনা বা পরিণাম (৫৭) আল-হাদীদ - লৌহ, (৫৮) আল-মুজাদালাহা - ঝগড়াটে নারী, (৫৯) আল-হাশর - নির্বাসন, (৬০) আল-মুমতাহিনা - পরীক্ষিত নারী, (৬১) আছছাফ - সাধারণ স্তরের জনগণ/রাজনীতিক কর্মীবৃন্দ, (৬২) আল-জুমুআহা - সমাবেশ, (৬৩) মুনাফিকুন - কপটচারীগণ (৬৪) আততাগাবুন - পারস্পরিক মোহ ভঙ্গ, (৬৫) আত-তালাক - বিবাহ বিচ্ছেদ, (৬৬) আত তাহরীম - নিষিদ্ধ, (৬৭) আল-মুলুক - সার্বভৌম, (৬৮) আল-কলম - কলম, (৬৯) আল-হাক্কাহ - বাস্তব বস্তু (৭০) আল-মাআরিজ - উদিয়মান সিঁড়ি (৭১) নূহ - পূর্ববর্তী নবী (৭২) আল-জ্বিন- অশরীরী, (৭৩) আল-মুযযাম্মিল - শবাচ্ছিদ ব্যক্তি (৭৪) আল-মুদ্দাসসির - গোপনকারী ব্যক্তি, (৭৫) আল-কিয়ামাহ - মৃত্যুর পর উত্থান (৭৬) আদ-দাহর - সময়/মানুষ (৭৭) আল-মুরসালাত - প্রেরিতগণ, (৭৮) আননারা - সংবাদ (৭৯) আন-নাযিয়াত - অনুসরণকারীর মত যারা সম্মুখে গমন করে, (৮০) তাবাসা - ভ্রুকুটিকারী, (৮১) আততাকভীর - সর্বনাশ করণ, (৮২) আল-ইনফিতার - দৃঢ়বদ্ধতা, (৮৩) আত-তাতফীফ - প্রতারণা করিয়া লওয়া (৮৪) আল-ইনশিফাক - বিচ্ছিন্নতা (৮৫) আল-বুরুজ - তারাদের বাসস্থান (৮৬) আত-তারিক - শুকতারা, (৮৭) আল-আ'লা - অতি উচ্চ (৮৮) আল-গাশিয়াহ - সংখ্যা, ওজন, পরিমাপ প্রভৃতিতে অত্যাধিক হওয়ার ফলে অদম্য (৮৯) আল-ফজর - ভোর হওয়া, (৯০) আল-বালাদ - নগর, (৯১) আশ-শামশ - সূর্য (৯২) আল-লাইল - রাত্রি (৯৩) আদ-দোহা - প্রভাতে (৯৪) আল-ইনশিরাহ - শান্তনা (৯৫) তীন-ডুমুর (৯৬) আলাক - তরল বস্তুর ঘনিভূত পিন্ড (৯৭) কদর - শক্তি বা ক্ষমতা (৯৮) বাইয়্যিনাহ - স্পষ্ট প্রমাণ, (৯৯) যিলযাল - ভূমিকম্প (১০০) আদিয়াত - দ্রুতগামী অশ্ব, (১০১) ক্বারেআহ - চরম দুর্দশা, (১০২) তাকাসুর - জাগতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি (১০৩) আসর - আনত দিন (১০৪) হুমাযাহা - নিন্দাকারী (১০৫) ফীল - হাতি, (১০৬) কোরাইশ - কোরাইশ বংশ (১০৭) মাউন - ক্ষুদ্র দয়াপরতা (১০৮) কাউসার - প্রাচুর্য (১০৯) কাফেরুন - অবিশ্বাসীগণ (১১০) নসর - বিপদ হইতে উদ্ধার করা (১১১) আল মাসাদ (লাহাব) - তালতন্তু, তালের আঁশ (১১২) এখলাস (আল-তৌহিদ) - একতা, (১১৩) ফালাক - উষা বা ভোর (১১৪) নাস - মানবজাতি/পুরুষবর্গ।

www.pathagar.com

ওপরোক্ত সূরা সমূহ থেকে এবার আল ক্বামার বা চাঁদ এবং যিলযাল বা ভূমিকম্প সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু উদ্ধৃত করতে চাই। সূরা আল-ক্বামার। সূরার শুরুটা এই- "পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু (১) কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটাতো চিরায়ত জাদু। (৩) তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথা সময়ে স্থিরিকৃত। .....।" সুরাটি বেশ বড়, অনেকেই জানেন। আমি এ প্রসঙ্গে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মোজেযা উল্লেখ করছি- মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ (সঃ) এর কাছে তার রেসালতের সপক্ষে কোন নির্দশন চাইলে আল্লাহতায়ালা তার সত্যতার প্রমাণ হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মোজেযা প্রকাশ করেন। এই মোজেযার প্রমাণ কোরআন এবং অনেক সহীহ হাদীসেও আছে। ঘটনার সার সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তার কাছে নবুওয়াতের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ তায়ালা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হয়ে এক খণ্ড পূর্ব দিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিম দিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ (সঃ) উপস্থিত সবাইকে বললেন- 'দেখ এবং সাক্ষ্য দাও।' সবাই যখন পরিস্কার রূপে এই মোজেযা দেখে নিল তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল।" চাঁদকে বিদীর্ণ করার প্রেক্ষিতে মুশরীকদের বিশ্বাস অবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে ওপরোক্ত সূরাটি নাজেল হয়েছে। স্বাভাবতই চাঁদ এসেছে ধর্মগ্রন্থে। চাঁদ কোথায় নেই? চাঁদ আছে সাহিত্যে শিল্পে, গল্পে উপন্যাসে। চাঁদ স্বপ্নে, ঘুম পাড়ানীর গানে। চাঁদ মায়ের মুখের অবয়বে। বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায়ও চাঁদ। চাঁদের পৃষ্ঠে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বিশাল বিশাল গর্ত। আরও আছে বড় বড় পাথরের চাঁই, নুড়ি, বালু কণা, যা মরুভূমির মত ধু ধু। চাঁদের ব্যাস ৩ হাজার ৪ শত ৭৫ কিঃ মিঃ। এর ওজন ৭·২৩ × $১০^{১৯}$ মেট্রিক টন। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৯ শত কিলোমিটার। চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবী তার অক্ষে ২৩·৫ ডিগ্রী হেলে আছে। এতো গেলো চাঁদের কথা। এবার সূরা যিলযাল বা ভূমিকম্প - "পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। (১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে, (২) যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে (৩) এবং মানুষ বলবে, এর কি হল? (৪) সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে (৫) কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন। (৬) সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃত কর্ম দেখানো হয়। অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে (৮) এবং কেউ অণুপরিমাণ অসৎকর্ম

www.pathagar.com

করলে তাও দেখতে পাবে।" এই সূরা দ্বারা শিংগা ফুঁকার ফলে ভূকম্পন বোঝানো হয়েছে এবং কেয়ামতের অবস্থা তথা হিসেব নিকেশের কথাও উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহর নির্দেশ পেলেই ইস্রাফিল ফেরেশতা শিংগা ফুকা দিবে, আর সাথে সাথে নেমে আসবে প্রলয় বা ভূ-কম্পন। পৃথিবী জুড়ে আজকে যে ছোট বড় অসংখ্য ভূকম্পন সৃষ্টি হচ্ছে তার কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে যে তত্ত্বটি আবিস্কারের ফলে আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা গ্রহণ করে ভূকম্পের ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে কিছুটা হলেও রক্ষা পাওয়া যায় তা হলো ডঃ রিখটারের 'ইলাস্টিক রিবাউন্ড মেকানিজম।' ডঃ রিখটারের নাম অনুসারে ভূকম্পন মাপার স্কেলটির নাম রিখটার স্কেল। ভূকম্পন সম্পর্কে ডঃ রিখটারের অভিমত- আমাদের ভূপৃষ্ঠের নীচে রয়েছে শিলাস্তর, প্রতিটি স্তর পাশাপাশি অবস্থিত। কোন কারণে শিলাস্তরে চাপ পড়লে আলগা হয়ে যায়, স্তর খসে ভূপৃষ্ঠের আরো নীচে চলে যায়। ফলে পার্শ্ববর্তী স্তরের তুলনায় এ অংশের অবস্থান পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী শিলাস্তর নড়ে ওঠে। নড়ে ওঠা থেকে ভূপৃষ্ঠে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়। এটি ভূমিকম্প। শিলাস্তরে এ চাপ পড়ে প্রাকৃতিক এবং মানুষের নিজেদের সৃষ্ট কারণে। পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ অর্ধ তরল পদার্থের নানা পরিবর্তনের ফলে শিলার স্তরে যে চাপের সৃষ্টি হয় তা প্রাকৃতিক। কিন্তু ভূ-পৃষ্ঠে তৈরী নানা ষ্ট্রাকচার এবং তার নানা আনুসাঙ্গিক অংশ যে চাপ দেয় সেটি মানুষের সৃষ্টি। ভূমিকম্পের কারণ বিষয়ে যতটুকু অবগত হওয়া গেছে সে অনুযায়ী মানুষ প্রতিরোধ ব্যবস্থার প্রযুক্তিও ব্যবহার করতে পারছে।

তৎকালীন আরবীয় সমাজ পরিবেশ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে ধর্মের বিষয় বক্তব্য আদেশ নির্দেশ আরব জাতির কালীন উন্নতি এবং সাংস্কৃতিক বিকাশের সহায়ক হলেও বর্তমান সমাজ পরিবেশ বাস্তবতায় তার পুরোপুরি প্রয়োগ অসম্ভব, অস্বাভাবিকও বটে। বিজ্ঞানের শক্তি বর্তমান মানবজাতিকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস, উচ্চাভিলাস এবং কর্তৃত্বের অহংকার। বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে মানুষ এখন জগৎমুখী, তারা ভাববাদ বর্জন এবং সৃজনশীল সৌন্দর্যময় কর্মজীবনকে গ্রহণ করতে চায়। কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানে বিজ্ঞানে অনুন্নত বাংলাদেশের মত অনেক দেশের ধূর্ত রাজনীতিবিদরা ধর্মকে বার বার হীন উদ্দেশ্যে টেনে এনে ব্যবহার করে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ের গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষকতাবাদ মানবসৃষ্ট মতবাদ, যা ইসলাম ও মুসলমানদের ঈমান আকিদা বিরোধী অথচ এই অনৈসলামিক বিষয়ে ইসলামকে ভেঙ্গে খাওয়ার কি উন্মাদনা! ধর্ম ব্যবসায়ীরা এরকম অসংখ্য বিষয় নিজেদের স্বার্থে ব্যাখ্যা এবং ফতোয়া দিয়ে গ্রহণ বর্জন করে যাচ্ছে। সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এদেশ। যেখানে প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বিধবা নূরজাহান এক যুবককে ভালবাসতে গিয়ে অনৈসলামিক কাজের

www.pathagar.com

জন্য ফতোয়াবাজদের নিক্ষিপ্ত পাথরে মৃত্যুবরণ করে, সেখানেই অসংখ্য নারী কেলেংকারীর নায়ক, ঘুষখোর দুর্নীতিবাজ, জনগণের সম্পদ হরণকারী কথিত স্বৈরাচার রাষ্ট্র প্রধানের জন্য পুরস্কার স্বরূপ আসে আজমীর শরীফ ও মদিনা শরীফের পবিত্র গিলাব।

আজমীর শরীফ মদিনা শরীফের গিলাবের এই যথেচ্ছার ব্যবহারই প্রমাণ করে দেয় ধর্মের নীতিবোধের অবস্থান কোথায়। এই ফাটল শুধু নীতিবোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, ধর্মের ভক্তিবোধের ফাটলও ব্যাপক এবং বিস্তর। বাংলাদেশের যে মুসলমানরা এতদিন গরুর মাংস খেয়ে ভক্তি ভরে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলতেন, তাদের কারো কারো ভক্তি গরুর মাংসকে ছেড়ে উটের পেচ্ছাবের দিকে ধাবিত। মহাপবিত্র ওরস উপলক্ষে আমদানীকৃত মরু পশু উটের পেচ্ছাবও নাকি পূন্যার্থে পান করছেন অনেক ভক্ত। প্রকাশ উটের পেচ্ছাবের বাজার দর উঠেছিল গ্লাস প্রতি এক টাকা। বুদ্ধি যুক্তি বিচার বিশ্লেষণ নয়, ভক্তিই যেখানে প্রধান সেখানে এ আর বিচিত্র কি?

বিশ্বের সকল মুসলমানের অতি প্রিয় মক্কা মদিনার অত্যন্ত পবিত্র দুই মসজিদ হেফাজকারী সৌদি বাদশা, রাজ পরিবার পরিজনদের নষ্টামী, ব্যক্তি চরিত্র, ভোগ বিলাস, জীবনযাত্রা প্রণালী ও অন্যান্য নৈতিকতা বিরোধী কর্মকান্ডের বিষয় সারা বিশ্বের Hot News. কিং আবদুল আজিজ ইবনে সউদতো তিনশরও বেশি বিয়ে করেছিলেন। এমন কি তাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত করার রাজতন্ত্রও ইসলাম বিরোধী। এই শরিয়ত বিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করাতো দূরের কথা, বরং তাদের ইসলামী প্রীতির প্রশংসায় সকলেই আত্মহারা। অথচ একটি সৃষ্টিশীল সাহিত্যকর্মের ফসল- 'দ্যা স্যাটানিক ভার্সেস' এর জন্য প্রতিভাধর লেখক সালমান রুশদির মৃত্যু দণ্ড ঘোষণা হয়। একজন মুক্ত চিন্তার লেখককে বধ করার জন্য বিশ্বব্যাপী মৌলবাদীরা তাণ্ডব নৃত্যে মাতোয়ারা। প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, রাজা-বাদশা, আমির শেখদের অনৈসলামিক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা না করে প্রগতিবাদী মুক্ত বুদ্ধির গণতান্ত্রিক সৃষ্টিশীল মানুষের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার উদ্দেশ্য আল্লাহ ভীতি বা ইসলাম প্রীতি নয়। এসব অর্থ সম্পদ পেট্রোডলারের মোহ এবং ধর্মীয় মৌলবাদী ভাবমূর্তিকে সামনে এনে ধর্মের নামে শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জেগে ওঠা জনগণের অসন্তোষকে চাপা দেওয়া। ধর্মের উৎপত্তি, বিশ্বাসের উৎস এবং মানব জীবনে এর প্রভাব নিয়ে মূল্যবান অনেক তথ্য এবং যুক্তি রেখে গেছেন বিভিন্ন ইতিহাসবিদ ও সমাজ গবেষকগণ। বিজ্ঞানের এই যুগে ধর্মের নেতিবাচক বিষয়গুলো বর্জন এবং ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি সম্মান দেখানোর মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত। একটা

www.pathagar.com

সময় ছিল যখন প্রকৃতির কাছে ছিল মানুষ খুবই অসহায়। রুদ্র রুষ্ট প্রকৃতি এবং হিংস্র জীবজন্তুর শক্তির কাছে জ্ঞান বিজ্ঞানের অভাবে মানুষের জীবন ছিল অনিশ্চয়তায় ভরা। হিংস্র জীব জন্তু ও প্রকৃতির মোকাবেলার জন্য মানুষের মনে জন্ম নেয় একটি বড় শক্তির কল্পনা। মানুষের সেই অজ্ঞতা এবং দুর্বলতার সুযোগে সেই কল্পিত শক্তিই পরবর্তীতে ঈশ্বর বা স্রষ্টা নামে অভিহিত হয়। বিখ্যাত চিন্তাবিদ Sir Edward B. Tailor তাঁর "Religion in Primitive Cultur" গ্রন্থে লিখেছেন- "আকাশ, পৃথিবী, সমুদ্র এসবে অবস্থিত ও তাদের নিয়ন্ত্রক শক্তিমান আত্মার ধারণাই সম্ভবত এশিয়ায় বিস্তৃত হয়ে পরমাত্মা, ঈশ্বর এসব ধারণার জন্ম দেয় এবং এ থেকেই সর্বত্র বিরাজমান পরম ব্রহ্মের সৃষ্টি হয়। পরে অন্যান্য ধর্মেও অনুরূপ সর্বশক্তিমান ব্রহ্ম স্বরূপ ঈশ্বর ধারণার সৃষ্টি হয়। বাস্তবিক ক্ষেত্রে এসব চিন্তাই নানা সক্রিয় পূজা-আর্চার জন্ম দেয়- অন্য দিকে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন দেব দেবীর। পৃথিবীর সব মানব গোষ্ঠীর মধ্যেই এই ব্যাপার ঘটেছে। কিন্তু তার প্রকাশ ঘটেছে তাদের পরিবেশ, প্রয়োজন ও সামাজিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয় নানা ধর্মমত ও ধর্মীয় দর্শনের।" বলা বাহুল্য ধর্ম, ধর্ম-দর্শনের মূল ভিত্তি অজ্ঞ অসহায় দুর্বল চিত্ত মানুষের ভাববাদী চিন্তা। কিন্তু মানুষ তার অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে আস্তে আস্তে আবিষ্কার করেছে নতুন নতুন হাতিয়ার, উন্নততর কৌশল। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই সভ্যতার উন্মেষ। পাশাপাশি একশ্রেণীর প্রভাবশালী স্বার্থপর মানুষ অতীতের শক্তিশালী ভাববাদী চিন্তাকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষকে ব্লাক মেইলিং করে আসছে। পর-জন্মে ঈশ্বরের অসীম কৃপা আর সানুগ্রহ লাভের মোহে এসব সাধারণ মানুষ জাগতিক সুখ স্বাচ্ছন্দ বিসর্জন দিয়ে সহ্য করছে সেই দুরভিসন্ধি মানুষের নানা জুলুম অত্যাচার।

৭ই জুলাই দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত একটি ছোট খবর। খবরটি পরিবেশন করে ইউনাইটেড নিউজ অব ইন্ডিয়া- "কটক নগরের ৬৭ বছর বয়স্ক এক অন্ধ ভিক্ষুক একটি হিন্দু মন্দিরে এক লাখ ১০ রুপি দান করেছে। কয়েক বছর ধরে সে এ অর্থ ভিক্ষাবৃত্তি করে সংগ্রহ করে।" সত্যি সেলুকাস, কি বিচিত্র এদেশ! ধর্মের কি প্রচণ্ড শক্তি! আল্লাহ ভীতির জন্য নয়, স্রেফ সাধারণ মানুষকে বোকা বানাবার জন্য শেখ হাসিনার ধর্মীয় লেবাস তার ভাগ্যে এনে দিলো প্রধানমন্ত্রীত্ব, আর অন্ধ ভিক্ষুক অমানুষিক পরিশ্রম করে কয়েক বছরের ভিক্ষাবৃত্তির সঞ্চয় এক লক্ষ দশ রুপি মন্দিরে দান করে হলো কপর্দক শূন্য, স্রেফ ধর্ম বিশ্বাসের কারণে। ভণ্ডামী এবং আচার অনুষ্ঠানে অন্ধ বিশ্বাসই ধার্মিকতার মাপকাঠি।

www.pathagar.com

ধর্মের কপটবিশ্বাসী ও কট্টর বিশ্বাসীদের কাছে মানবতাবাদীরা যুগে যুগে পদে পদে লাঞ্ছিত নিগৃহীত হয়ে আসছে। পরিশেষে এ প্রসংগে মির্জা গালিব থেকে একটি উদ্ধৃতি-

"দৈর নহিঁ, হরম নহিঁ, দর নহিঁ, আস্তা নহিঁ
বৈঠে হেঁ রাহ গুজর হম
গের হমে উঠায়ে কিউ?"
বঙ্গানুবাদ-
মন্দির নয়, কা'বা নয়, কারও দরজা নয়, আস্তানা নয়;
বসে আছি পথের ধারে
সেখান থেকেও আমাকে উঠিয়ে দেয় কেন?

তথ্যসূত্র:

(১) The meaning of "The Glorious Koran" Translation by Mohammed Marmaduke Pickthall.
(২) পবিত্র কোরআনুল করীম, মূল-তফসীর মাআরেফুল কোরআন হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহঃ)।
অনুবাদ ও সম্পাদনা - মাওলানা মুহিউদ্দীন খাঁন।
(৩) কুরআনের শিক্ষা-
সংকলনে- মোহাম্মদ মজহারুর কুদ্দুস, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
(৪) ইলামের অর্থ বন্টন ব্যবস্থা -
ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।
(৫) শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোট ঃ সাইফউদ্দীন ইয়াহইয়া, কাবা প্রকাশনী।
(৬) নেয়ামূল-কুরআন - মৌলভী মোহাম্মদ সামসুল হুদা
(৭) Religion in Primitive culture by Sir Edward B. Tailor.

www.pathagar.com

অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ ভালবাসা

লিখতে চেয়েছিলাম শেফালী জরিনা দিপালী রহিমা আলতাবানুদের কথা। বাবা মা'র দেওয়া সেই নামে ওদের আর কেউ চেনে না, ওদের পরিচয় গার্মেন্টিসের মাইয়া, বস্তির ছেঁড়ি, কাজের বুয়া নামে।

লিখতে চেয়েছিলাম ছায়া সুনিবিড় সবুজ শ্যামল গাঁয়ের রাখাল বালক কৃষাণ ছেলে আলাল দুলালদের কথা। যাদের হাতের ছোঁয়ায় বাঁশ হতো বাঁশের বাঁশি; যাদের কোমল আঙ্গুলের কুশলী খেলায় সেই বাঁশি ফুঁড়ে ছড়াতো হৃদয় আকুল করা সুর, আলাল-দুলালদের সেই হাতে আজ কারখানার হাতুড়ী শাবল, রিক্সার হ্যান্ডেল, টেম্পো-স্কুটারের স্টীয়ারিং।

মাথায় ভীড় করছিলো আরো কত কী কথা। গ্রামের জোতদার মহাজনের অত্যাচারে বাপদাদার ভিটে ছেড়ে শহরে আসার কথা। রাস্তা ফুটপাথে খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকার কথা; পুলিশ মাস্তানদের লাথি-গুতার কথা। অগত্যা কাগজ পলিথিন কুড়িয়ে জলাডোবা নর্দমা এবং রেল লাইনের আশপাশে বস্তি গড়ার কথা। দাউ দাউ আগুনের লেলিহান শিখায় সে বস্তি জ্বলে পুড়ে ছাই হওয়ার কথা। তারপর সেই ছাইয়ের ওপর বিদেশী সিমেন্ট-ইট-মার্বেলে প্রাসাদোপম অট্টালিকার কথা।

না ওসব কথা আজ বলা যাবে না; বাসি পচা একই কথা নাকি আমার সব লেখায়ই থাকে। বাসি পচা নয়; তাজা টাটকা রমরমা কিছু চাই; যেখানে প্রাণের উত্তাপ আছে; আছে শাশ্বত প্রেম। তাজা টাটকা প্রেমের সন্ধানে আমাকে খুলে বসতে হলো নোট বইয়ের পাতা। পাতা ওল্টাতে নজরে পড়লো '১৪ই ফেব্রুয়ারি, আজ ভ্যালেন্টাইন্স ডে'- বিশ্ব ভালবাসা দিবস।

www.pathagar.com

যেহেতু প্রাণের উত্তাপ মিশ্রিত প্রসঙ্গ ভালবাসা, তার নীচেই লেখা ভালবাসার যুৎসই ভাষা একটি কবিতা-

বিরক্ত করেছি অনেক
ছুটে গিয়েছি কাছে
পকেট থেকে হাতে নিয়েছি হৃদয়
তুমি দেখেছো কাগজ, আমি বলেছি কবিতা।
পাগলামী বলে ফিরিয়েছো মুখ তোমার
হৃদয় আর কাগজ
কবিতা ও পাগলামীর তর্কে না গিয়ে বলেছি-
'মাত্রই শেষ করে এলাম প্রথম শুনাবো বলে।'
তোমার হাজারো ব্যস্ততা বিরক্ত কিংবা তিরস্কার
দমাতে পারেনি আমায়।
এক নিঃশ্বাসে পড়েছি
হৃদয়ের গোছগাছ কথাগুলো সব।
বলেছো 'খোদা হাফেজ, পরে কথা হবে'
না, হয়নি এই নিয়ে কিছু বলার সময় কখনো আর।
দেখা হলেই বলেছি- একটু দাঁড়াও।
বিরক্ত হয়েছো তুমি- 'উহ্ আবার কবিতা?
এখন কি কবিতা শোনার সময়?'
দু'হাত চেপেছো কানে
তবুও শুনিয়েছি পড়ে নাছোড়বান্দা আমি।
"কবিকে ভালবেসে ভারিতো ফ্যাসাদ" বলেছো বহুদিন
একটুও লাগেনি আমার
আবার লিখেছি, গিয়েছি ছুটে প্রথম শুনাবো বলে।
শোননি, তুমি শোননি
একটিবারও মনোযোগ দিয়ে একটি কবিতাও আমার।
বিরক্ত করে করে
নিজেও ক্লান্ত হলাম শেষে
শেষ কবিতাটা কিছুতে হলো না শেষ।

www.pathagar.com

জানতেও পারলে না তুমি
তোমাদের সুন্দর পৃথিবীর সব রূপ সব রঙ সব গন্ধ ছেড়ে
দূরে বহু দূরে নির্জনে একা একা
কি মানসিক চাপক্লিষ্ট আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি
শেষ কবিতাটি শেষ করবো বলে।
স্থবির নিশ্চল পরিচর্চাহীন এ আমার হাতে পায়ে
এমনকি মুখ গহবরে
চড়ে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে পিঁপড়েরা।।
রক্তাক্ত থেতলানো আমি তখনও বলতে চাচ্ছি
শেষ নিঃশ্বাসের সাথে
অসমাপ্ত শেষ কবিতাটির শিরোনাম
তবুও ভালবাসি, ভালবাসি তোমাকে।

রোম সাম্রাজ্যের প্রতিবাদী প্রেমিক ভ্যালেন্টাইন থেকে আবেগ অনুভূতিতে কিছু কম যান না এই প্রেমিক কবি। রোমের সম্রাট ক্লডিয়াস যখন যুদ্ধের প্রয়োজনে প্রেম ও বিয়ে প্রথা নিষিদ্ধ করার ব্যবস্থা নিলেন, তখন টগবগে তরুণ প্রেমিক ভ্যালেন্টাইন প্রেম করে সম্রাটের নির্দেশে ধড় থেকে হারালেন তাঁর মাথা। পরবর্তী কালে বিশ্বের প্রেমিকরা ভ্যালেন্টাইনের মাথা কাটার দিনটি অর্থাৎ ১৪ই ফেব্রুয়ারিকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে বা বিশ্ব ভালবাসার দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন। স্যাটেলাইট টেলিভিশনের প্রভাবে পাশ্চাত্য দেশগুলোর মতো বাংলাদেশের গুলশান, বারিধারা, বনানী, ধানমন্ডি অভিজাত এলাকার তরুণ তরুণীরা এই ভালবাসার দিবসটি পালন করছেন বেশ জাঁকজমক ভাবে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, ক্লাব, হোটেল, রেস্তোরায় এই দিনে দেখা যায় ভালবাসার কার্ড আর ফুলের ছড়াছড়ি। দেখা যায় প্রেমিক প্রেমিকাদের বিচিত্র হাসিক ঝিলিক। হ্যা, সত্যি আমি আজ লিখতে চেয়েছিলাম তারুণ্যের উত্তাপ আর সেই উত্তাপের রাসায়নিক উপাদানের কথা। কিন্তু আমার বিবেকের কাছে আমি আজ হাজার প্রশ্নের সম্মুখীন। তারুণ্যের উন্মাদনা কি শুধু যৌন প্রেরণা মূলক? সেখানে কি ঘৃণা প্রতিবাদের লেশ মাত্রও থাকতে নেই? অবশ্যই আমি তারুণ্যের জয়গান রচিতাম, যদি দেখতাম ভালবাসার সুতীব্র আকর্ষণে তরুণ তরুণীরা যেমন ফুল কার্ডের দোকানে ভীড় জমায়; তেমনই ঘেন্নায় অপমানে তারা পুরাতন ছেঁড়া জুতা- সেন্ডেলের দোকানে ভীড় করে ছেঁড়া জুতা এনে ছুঁড়ে মেরেছে সেই পুরুষদের মুখে, যারা বিয়ে ভালবাসার নামে ধৃষ্টতাপূর্ণ অশালীন মন্তব্য করছে মেয়েদের নিয়ে।

www.pathagar.com

বুঝতাম তারুণ্যে তাগদ আছে, আছে ভালবাসার মূল্য। জানিনা মেয়েদের নিয়ে এমন অশালীন কথা বলেও কীভাবে পার পেয়ে গেলেন আমাদের মেয়ে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানীত বুড্ডা পুরুষ পররাষ্ট্র মন্ত্রী সামাদ আজাদ সাহেব। দৈনিক মানবজমিন পত্রিকায় ১০/১১/৯৮ তারিখে প্রকাশ বিয়ে পাগল বৃদ্ধ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ তাঁর বিয়ের খবরের প্রশ্নের পিঠে স্মিত হাসি হেসে সাংবাদিককে প্রশ্ন রাখেন "বিয়েতো খুশির খবর, কিন্তু জিনিস কোথায়, জিনিস দেখছি নাতো।" যে দেশের প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি মেয়েদেরকে জিনিস বলে বিবেচনা করেন; সেই দেশে কিসের প্রেম, কিসের সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে? মন্ত্রীর এই মন্তব্য শুধু মেয়েদেরকেই হেয় প্রতিপন্ন করেনি; অপমান করেছে ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন রোমের অকৃত্রিম প্রেমিক ভ্যালেন্টাইনকে, তিনি অপমান করেছেন হাত পা মুখ গহবরে পিঁপড়ে চড়ে বেড়ানো বাঙালি কবির নিঃস্বার্থ ভালবাসাকে। পদাঘাত করেছেন দেশের প্রায় ৫ কোটি তরুণ তরুণীর পবিত্র অনুভূতিকে। না, কোথাও এই নোংরামির প্রাতিবাদ নেই। চোখে পড়েনি দেশের নারী সংগঠন গুলোরও কোন জবাব। অতএব এ দেশে সবই সম্ভব। সম্ভব সর্বোচ্চ শিক্ষাঙ্গন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীকে যৌন হয়রানি। সম্ভব জেল হাজতে, কোট কাচারীতে পুলিশ কর্তৃক আসামী অনাসামী নারী ধর্ষণ। এই অন্যায়, এই যথেচ্ছাচারের বিচার নেই; নেই শাস্তির বিধান। ছিঃ! শতধিক্ এই দেশের বিচার ব্যবস্থাকে। যখন সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতিগণ হেফাজুর রহমান বনাম শামসুন্নাহার বেগমের মধ্যকার তালাক পরবর্তী খোরপোশ দাবি সংক্রান্ত মামলার রায়ের জন্য বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব কট্টর মৌলবাদী মওলানা উবায়দুল হক এবং মাসিক মদিনা পত্রিকার সম্পাদক ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক মাওলানা মহিউদ্দিন আহমেদের দ্বারস্থ হন, তখন বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না। ব্যথা ভারাক্রান্ত মনে আরো বিস্মিত হই আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সুপ্রিম কোর্টের বিচারকরা যখন উক্ত ধিকৃত ব্যক্তিদ্বয়ের পরামর্শে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের ফতোয়া দিয়ে তালাক প্রাপ্ত অসহায় শামসুন্নাহার বেগমকে নৈতিক মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার রায় দেন।

অতএব বলতে হয় আনন্দ উৎসব মুখর 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে'র আদৌ কি কোন যুক্তি আছে এই দেশে? সম্রাট ক্লডিয়াসের প্রেতাত্মার রাহুগ্রাস হতে এখনো মুক্ত হতে পারেনি আমাদের রাষ্ট্রীক সামাজিক বিধি ব্যবস্থা। এতদ্ব কারণে ভালবাসা আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ। প্রেম ভালবাসার মজা টাটকা কিছু লিখতে না পারায় দুঃখিত।

www.pathagar.com

যে সকল পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধগুলো ছাপা হয়েছিল

প্রবন্ধের নাম	পত্রিকা	প্রকাশকাল
ঝাড়-ফুঁক, মাজার-মসজিদ কালচার	পর্যাস	নভেম্বর '৯৭
	সংকেত	১৫ ডিসেম্বর '৯৭
	গণশক্তি	৩ এপ্রিল '৯৮
আত্মতুষ্টি নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা	পর্যাস	জানুয়ারী '৯৮
	অণুবীক্ষণ	১৯ জুলাই '৯৮
	গণশক্তি	১৩ নভেম্বর '৯৮
রুখে দাঁড়াও লড়াকু জনতা	পর্যাস	মে '৯৮
সমীপে আহমদ শরীফ	পর্যাস	আগষ্ট '৯৭
আজকের রূপকাহিনী	পর্যাস	সেপ্টেম্বর '৯৮
সরস্বতী বন্দনা	পর্যাস	অক্টোবর '৯৬
সংবাদপত্রের চালচিত্র	পর্যাস	জুন '৯৭
আমেরিকা-ক্লিনটন বিষয়ক পাঁচালি	পর্যাস	অক্টোবর '৯৮
	জয়যাত্রা	১০ নভেম্বর '৯৮
কী চমৎকার দেখা গেলো	পর্যাস	মে '৯৮
দৈর নহিঁ হরম নহিঁ	পর্যাস	আগষ্ট '৯৬
শ্রমিকের শোষণমুক্তি প্রসঙ্গে	পর্যাস	এপ্রিল '৯৬
ছিঃ হাসিনা-খালেদা, ছিঃ বামফ্রন্ট	পর্যাস	জুলাই '৯৬
হে নারী	পর্যাস	ডিসেম্বর '৯৫
	জয়যাত্রা	২৪ নভেম্বর '৯৮
আমার বঁধূয়া আন বাড়ি যায়	পর্যাস	ফেব্রুয়ারি '৯৭
খেলাপী ঋণ সমাচার	পর্যাস	এপ্রিল '৯৭
বিদ্রোহের প্রতীক মুমিয়া আবুজামাল	পর্যাস	সেপ্টেম্বর '৯৫
পরম্পরা মেঘলাদের কথা	পর্যাস	নভেম্বর '৯৪
প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্পের সংকট	প্রগতি লেখক শিল্পী	
এবং সম্ভাবনা	সংসদের সেমিনারে পঠিত	২৭ জুলাই '৯৪
	দৈনিক আল আমিন	১৭ ও ২৪ নভেঃ
		ও ১ ডিসেম্বর '৯৪
অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ ভালবাসা	পর্যাস	ডিসেম্বর '৯৮

www.pathagar.com

প্রিয় ব্যক্তিত্ব ড. আহমদ শরীফের সাথে হাসান ফকরী

হাসান ফকরীর নানামুখী গুণের, শক্তির ও প্রবণতার অভিব্যক্তি প্রবন্ধ রচনও একটি। আলোচ্য "পলিটিক্স্ বনাম পলিট্রিক্স্" গ্রন্থে নামে নানা ধরনের লেখা আছে বটে, তবে লক্ষ্যে সব লেখাই পরিণামে অভিন্ন। সবটাই মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পৃক্ত এবং লক্ষ্য জনগণ কল্যাণে সমাজের আধিমুক্তি প্রয়াস। কয়েকটা শিরোনামের উল্লেখেই আমাদের এ মত-মন্তব্য-সিদ্ধান্তের সাক্ষ্য প্রমাণ মিলবে। যেমন "আত্মতুষ্টি নাকি আত্মপ্রবঞ্চনা", "রুখে দাঁড়াও লড়াকু জনতা", "ঝাড়-ফুঁক, মাজার-মসজিদ কালচার", "শ্রমিকের শোষণমুক্তি প্রসঙ্গে", "হে নারী", "প্রগতিশীল সাহিত্য ও শিল্পের সঙ্কট এবং সম্ভাবনা" প্রভৃতি।

এর থেকে লেখকের যে কেবল দেশ-জাতি, মানুষ, রাষ্ট্র সচেতনতার সাক্ষ্য মেলে তা নয়, তাঁর মন-মগজ, মননের উচুঁমানের ও প্রসারের পরিচয়ও পাই আমরা। দেশের ও আমজনতার স্বার্থেই তাঁর এ গ্রন্থের বহুল পঠন ও প্রচার কামনা করি। এই বই কিনে পড়লে অর্থ, সময় ও শ্রম বৃথা নষ্ট হবে না।

আহমদ শরীফ